বসু বিজ্ঞান মন্দির ও জগদীশচন্দ্র

বসু বিজ্ঞান মন্দির ও জগদীশচন্দ্র

ডঃ শৈলেন ভট্টাচার্য, এম. এস.-সি.

এন ভট্টাচার্য এণ্ড কোং
৫, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-৭৩

প্রকাশক :
ললিত ভট্টাচার্য
৫, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-৭৩

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারী, ১৯৮৯

মূল্য : আঠারো টাকা মাত্র

মুদ্রক :
শ্রীঅনিলকুমার ঘোষ
দি অশোক প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২০৯এ, বিধান সরণী
কলিকাতা-৭০০ ০০৬

ভূমিকা

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু বাঙালী তথা ভারতীয়দের গর্ব। তিনি বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী। তিনি যে সময় বিজ্ঞানচর্চা করেছেন তখন ভারতবর্ষ বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিতে ইউরোপের অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক পিছিয়ে। ভারতবর্ষ ছিল বিদেশী ইংরেজের পদানত। ভারতীয় কোন ব্যক্তি বিজ্ঞানে বা শিল্পে বিশ্বের দরবারে খ্যাতিলাভ করুক তা ইংরেজদের মনঃপুত ছিল না। ফলে পদে পদে তারা জগদীশচন্দ্রের গবেষণার ব্যাপারে বাধা সৃষ্টি করেছে। জগদীশচন্দ্রের পিতাও পুত্রের উচ্চশিক্ষার খরচ চালাতে গিয়ে ঋণভারে জর্জরিত হয়ে গিয়েছিলেন। সেই আর্থ-সামাজিক পরিবেশে সম্পূর্ণ প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে তীব্র সংগ্রাম করে জগদীশচন্দ্র বিশ্বের দরবারে বাঙালী তথা ভারতীয়দের মুখোজ্জ্বল করেছেন। তাঁর জীবন একনিষ্ঠ বিজ্ঞান সাধকের জীবন। একদিকে তিনি ছিলেন অসাধারণ বিজ্ঞান প্রতিভার অধিকারী আর একদিকে ছিলেন সাহিত্যিক ও দার্শনিক। বিজ্ঞান, সাহিত্য এবং দর্শন এই তিনেরই সমন্বয় ঘটেছিল এই মনীষীর জীবনে। তাই বাংলা তথা ভারতের প্রতিটি ছেলে-মেয়ের উচিত এই মহাপুরুষের জীবনী পাঠ করা।

আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে সার্থক মনে করব তখনই যখন দেখব আমাদের ছেলে-মেয়েরা এই গ্রন্থপাঠে জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক প্রতিভা সম্পর্কে কিছুমাত্র অবহিত হয়েছে।

সব শেষে কৃতজ্ঞচিত্তে জানাই যে এই গ্রন্থ রচনায় ডাঃ বিমলেন্দু মিত্রের "বিজ্ঞান পথিকৃৎ জগদীশচন্দ্র বসু" এবং সুবোধচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের "আচার্য জগদীশচন্দ্র" বই দুইটি প্রভূত সাহায্য করেছে। ডাঃ মিত্র এবং শ্রীযুক্ত গঙ্গোপাধ্যায়কে তাই আন্তরিক ধন্যবাদ দিয়ে এখানেই শেষ করছি।

তারিখ ঃ ৮ই মাঘ, ১৩৯৫ — লেখক

শৈশব

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু বিশ্বের অন্যতম বিজ্ঞান পথিকৃৎ ছিলেন। এই মহান বিজ্ঞানীর আবির্ভাব ঘটে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে নভেম্বর পূর্ববঙ্গের (বর্তমান বাংলাদেশ) ময়মনসিং শহরে। জগদীশচন্দ্রের পিতার নাম ভগবানচন্দ্র। ১৮৫৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়। ১৮৫৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত এন্ট্রান্স পরীক্ষায় ভগবানচন্দ্র অত্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করেন। ঐ বছরই জগদীশচন্দ্রের জন্ম, আর ওই বছরই ২৩শে সেপ্টেম্বর ভগবানচন্দ্র ময়মনসিং জেলার ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টরের পদে নিযুক্ত হন।

জগদীশচন্দ্রের মায়ের নাম বামাসুন্দরী। ভগবানচন্দ্রের পরিবারের আদিনিবাস ছিল ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগনার রাঢ়িখাল গ্রামে। বসুপরিবার ছিল রাঢ়িখালের সচ্ছল ও সম্মানিত পরিবার। তখনকার-দিনে বিক্রমপুর ছিল শিক্ষায় অগ্রণী। ভগবানচন্দ্র ছিলেন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্ম। তখনকার ব্রাহ্মসমাজের সকলেই ছিলেন উচ্চশিক্ষিত, সংস্কার মুক্ত এবং জাতীয়তা বোধে উদ্বুদ্ধ। ভগবানচন্দ্র এবং বামাসুন্দরী দুজনেই ছিলেন দৃঢ়চেতা, আধুনিক চিন্তাধারায় মণ্ডিত চরিত্রবলের অধিকারী।

ভাগবানচন্দ্রের উদারতা এবং মহানুভবতা তাঁর কর্মজীবনের বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে প্রতিফলিত। একবার এক দুর্ধর্ষ ডাকাত ধরা পড়ল। বিচার হল ম্যাজিস্ট্রেট ভগবানচন্দ্রের এজলাসে। ঘটনার সাক্ষীপ্রমাণে ডাকাতিতে ওই ব্যক্তির যোগসাজস প্রমাণিত হয়ে গেল। ভগবানচন্দ্র তাঁকে কঠোর সাজা দিলেন। জেল খাটার পালা শেষ হয়ে গেলে লোকটি ফিরে গেল নিজের গ্রামে কিছু উপার্জন করে জীবিকানির্বাহ করতে। একে জেল খাটা আসামী, তার উপর দুর্ধর্ষ ডাকাত। কে তাকে চাকরি দেবে! উপায়ান্তর না দেখে লোকটি ভগবানচন্দ্রের কাছে যাওয়াই

স্থির করল। সব শুনে ভগবানচন্দ্র তাকে নিজের বাড়ীতেই চাকরি দিলেন। তার কাজ হল শিশু জগদীশচন্দ্রকে বিদ্যালয়ে পৌঁছে দেওয়া এবং ছুটির পর বিদ্যালয় থেকে বাড়ীতে নিয়ে আসা। ডাকাতের কাঁধে চড়ে বালক জগদীশচন্দ্র প্রত্যেক দিন স্কুলে যাতায়াত করতেন এবং ডাকাতের মুখে তার ডাকাতজীবনের প্রত্যক্ষ ঘটনার বিবরণ শুনতেন। এইভাবে চাকরের সঙ্গে বালক জগদীশচন্দ্রের অন্তরঙ্গতা বেড়ে চলে।

সাধারণ মানুষের দুঃখ কষ্টে ভগবানচন্দ্র ব্যথিত হতেন। ভগবানচন্দ্র তখন পূর্ববঙ্গের আর একটি জেলা ফরিদপুরের ম্যাজিস্ট্রেট। ওই জেলায় একটি মাত্র জেলাস্কুল ; ওই স্কুলের আসনসংখ্যা ছিল সীমিত। তাই জেলার মানুষ ভগবানচন্দ্রকে ধরল ওই জেলায় একটি বাংলা স্কুল খুলতে। সাধারণ মানুষের অসুবিধার কথা চিন্তা করে ভগবানচন্দ্র বাংলা বিদ্যালয় খুললেন এবং ওই বাংলা স্কুলেই বালক জগদীশচন্দ্রকে ভর্তি করে দিলেন। তখনকার দিনে ইংরেজী স্কুলে পড়াকে লোকে আভিজাত্যের প্রতীক হিসেবে গণ্য করত। কিন্তু ওইসব ঠুনকো আভিজাত্যের মোহ ত্যাগ করে ভগবানচন্দ্র নিজের ছেলেকে দরিদ্র মুসলমান এবং জেলেদের সঙ্গে পড়তে দিলেন। স্কুলে জগদীশচন্দ্রের ডাইনে তাঁর পিতার এক মুসলমান চাপরাশীর ছেলে বসত এবং বামে বসত এক ধীবরের ছেলে। তাদের কাছে বালক জগদীশচন্দ্র পশুপক্ষী এবং অন্যান্য জীবজন্তুর জীবনবৃত্তান্ত স্তব্ধ হয়ে শুনত। সম্ভবতঃ প্রকৃতির কার্য অনুসন্ধানে অনুরাগ এবং আগ্রহ এইসব ঘটনা থেকেই তাঁর মনে বদ্ধমূল হয়েছিল।

ভবিষ্যতের সূচনা

বিদ্যালয়ে যাতায়াতের পথের ধারে অজস্র গাছপালা, বনজঙ্গল, তার মধ্যে কতরকমই না গাছ। একদিন জগদীশচন্দ্র বিদ্যালয় যাওয়ার পথে লজ্জাবতী গাছের লতা দেখতে পেলেন। তাঁর সহপাঠী

তাকে ম্যাজিক দেখাবার ছলে ওই লতাকে ছুঁয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে লতাটি নুয়ে পড়ল। এই ঘটনা বালক জগদীশচন্দ্রের মনে অদম্য কৌতূহলের সৃষ্টি করল। এর পর অনেকদিন বিদ্যালয় যাবার পথে তিনি লজ্জাবতী গাছের লতা ছুঁয়ে একই অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন। তখন থেকেই হয়ত তাঁর অনুসন্ধিৎসু মনের গভীরে বার বার ঝিলিক দিয়েছে একটিই কথা—তা হলে গাছেরও কি প্রাণ আছে?

এক বছর বাহনের কাঁধে বিদ্যালয়ে যাওয়া-আসার পর পিতা জগদীশচন্দ্রকে একটি টাট্টু ঘোড়া কিনে দিলেন। বাহনের তত্ত্বাবধানে জগদীশচন্দ্র প্রত্যহ বিদ্যালয়ে যাওয়া-আসা করতে লাগলেন। ওই বাহন প্রায় চার পাঁচ বছর ভগবানচন্দ্রের কাছে ছিল। ওই দীর্ঘসময়ে মুহূর্তের জন্যও সে অবিশ্বাসের কোন কারণ হয় নি। একবার সে সমস্ত পরিবারকে ভীষণ বিপদের হাত থেকে বাঁচিয়েছিল। একবার ভগবানচন্দ্র সমস্ত পরিবারর্গ নিয়ে গ্রামের বাড়ী রাঢ়ীখালে যাত্রা করলেন। দীর্ঘদিনের পথ। পথে বিপদও আছে। হঠাৎ একদিন একটি অপরিচিত নৌকো একটা খাল থেকে বার হয়েই তাঁদের নৌকোর দিকে দ্রুতবেগে অগ্রসর হতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সকলে বুঝে গেলেন যে ডাকাতের নৌকো তাদের পিছু নিয়েছে। এদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার কোন উপায় নেই। ভগবানচন্দ্রের নিযুক্ত সেই ডাকাতও বুঝে গেল পরিস্থিতিটা। সে তৎক্ষণাৎ নৌকোর ছাদের উপর উঠে গেল এবং নিজেকে সকলের কাছে দৃশ্যমান করে ইঙ্গিতবাহী একটা লম্বা শিস দিল। সেই শিস কেবল ডাকাতদের উপস্থিতিই অন্য ডাকাতকে জানান দিয়ে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে ডাকাত দলের নৌকো অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে মুহূর্তের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

গাছপালা এবং পশু সম্বন্ধে ঔৎসুক্য

সারা দিন শত কাজে ব্যস্ত থাকলেও ভগবানচন্দ্র পুত্রের শিক্ষার ব্যাপারটা নিজেই দেখাশুনা করতেন। রাত্রিবেলা আহারান্তে শুয়ে

শুয়ে তিনি জগদীশচন্দ্রকে পড়াশুনা বলে দিতেন। সমস্ত দিন বালক জগদীশচন্দ্র যা কিছু দেখেছেন, যে সমস্ত প্রশ্ন তাঁর মনের গহনে উঁকি-ঝুঁকি মেরেছে তার উত্তর তিনি দিনের শেষে পিতার কাছে থেকে জেনে নেবার চেষ্টা করতেন। বনচাঁড়াল আর লজ্জাবতী গাছের পাতা ছুঁয়ে দিলে নুয়ে পড়ে, কিন্তু আম, জাম, কাঁঠাল, নারকেল, কলা প্রভৃতি গাছকে ছুঁয়ে দিলে সেসব গাছ কেন নুয়ে পড়ে না? এই রকম আরও নানা জিজ্ঞাসা থাকে পিতার কাছে বালক জগদীশচন্দ্রের। পিতা উত্তর দিতেন—হয়ত সব গাছের সাড়া দেবার পদ্ধতি একরকম নয়। তবে মুনিঋষিরা বলে গেছেন মানুষ এবং পশুপক্ষীর যেমন প্রাণ আছে গাছপালারও তেমনি প্রাণ আছে। তুমি বড় হয়ে এ সব আরও ভালভাবে জানবার চেষ্টা কর। এইভাবে ভগবানচন্দ্র পুত্র জগদীশচন্দ্রের মধ্যে জীবজগৎ সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসার বীজ বপন করে দিতেন? আর কেনা জানে শিশুমনে কৌতূহল জাগিয়ে দেওয়াই তার শিক্ষার সর্বোৎকৃষ্ট উপায়।

যেমন গাছপালা সম্বন্ধে তেমনি জীবজন্তু সম্বন্ধেও বালক জগদীশ-চন্দ্রের কৌতূহলের অন্ত ছিল না। পথের ধারে ডোবায় সহপাঠীদের সঙ্গে মাছ ধরার সময় বালক জগদীশচন্দ্র বিশেষভাবে লক্ষ্য করতেন মাছ কেমন করে সাঁতার কাটে, কেন তাদের কানকো বার বার খোলে আর বন্ধ করে, কেন তারা চোখ বোঁজেনা।

দেশজ সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ

ভগবানচন্দ্র চান নি পুত্র জগদীশচন্দ্র নব্য ইংরেজী সংস্কৃতির বাহক হোন। তাঁর এই মনোভাব জগদীশচন্দ্রের জীবনে প্রতিফলিত হয়েছিল। দেশীয় ধর্মগ্রন্থ, পুরাণ ইত্যাদির প্রতি জগদীশচন্দ্রের ছিল সহজাত অনুরাগ। রামায়ণ. মহাভারত ইত্যাদি গ্রন্থ শৈশব থেকেই জগদীশচন্দ্রকে আকৃষ্ট করত। রামায়ণ এবং মহাভারত অবলম্বন করে যে যাত্রা হত জগদীশচন্দ্র তা বিভোর হয়ে দেখতেন। তাঁর কাছে রামচরিত্রই ছিল আদর্শ। রামচন্দ্রের অনুজ লক্ষ্মণকেও তাঁর ভাল

লাগত। ভাই যদি হতে হয় তো লক্ষণের মত হওয়াই বাঞ্ছনীয় যে নাকি বিপদে আপদে সুখে দুঃখে দাদার নিত্যসঙ্গী।

মহাভারতের মধ্যে কর্ণচরিত্রকে জগদীশচন্দ্রের ভাল লাগত। কর্ণের বীরত্ব তাঁর শিশুমনকে এমনই আকৃষ্ট করেছিল যে গ্রামে মহাভারতের যাত্রাভিনয় হলে তিনি স্বয়ং কর্ণের ভূমিকায় অভিনয় করতেন। জীবনের পরবর্তী সময়ের বেশীর ভাগ বিজ্ঞান সাধনায় ব্যাপৃত থাকলেও জগদীশচন্দ্র কর্ণচরিত্র বিস্মৃত হন নি। কর্ণের পাঠ তিনি বার্ধ্যকেও গড় গড় করে মুখস্ত করে যেতে পারতেন।

কর্ণের আদর্শ ই জগদীশচন্দ্র তাঁর পিতার মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছেন। দেশবাসীর কল্যাণকল্পে ভগবানচন্দ্র সমস্ত জীবন কাজ করে গিয়েছেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি কর্ণের মহত্ব, কর্ণের পুরুষকার, কর্ণের পরহিতব্রত অনুসরণ করে গিয়েছেন। এই বীরত্ব, এই পুরুষকারের ভিতরেই পিতার অনুসরণে জগদীশচন্দ্র তাঁর আদর্শকে স্থির লক্ষ্যে সারা জীবন জয় পরাজয়ে অনুসরণ করে এসেছেন।

সেণ্ট জেভিয়ার্স স্কুলে ও কলেজে

ভগবানচন্দ্র কর্মসূত্রে বর্ধমানে বদলী হলেন। তখন জগদীশচন্দ্রের বয়স দশ বছর। ভগবানচন্দ্র পুত্রকে কলকাতায় হেয়ার স্কুলে ভর্তি করে দিলেন। কিন্তু কয়েক মাস কাটতেই তিনি জগদীশচন্দ্রকে সেণ্ট জেভিয়ার্স স্কুলে ভর্তি করে দিলেন। সেণ্ট জেভিয়ার্স স্কুলে তখন বেশীর ভাগ সাহেবদের ছেলেরাই পড়ত। পড়াশুনা হত ইংরেজী ভাষায়। প্রথম প্রথম জগদীশচন্দ্রের অসুবিধা হত। কিন্তু দৃঢ় মনোবলে সেই অসুবিধা দশ বছরের বালক জগদীশচন্দ্র শীঘ্রই কাটিয়ে উঠলেন। জগদীশচন্দ্র থাকতেন একটি ছাত্রাবাসে। মির্জাপুরের ঐ ছাত্রাবাসে থাকতেন সেই সময়কার ব্রাহ্মপরিবার থেকে আসা ছাত্ররা। ব্রাহ্মধর্মের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক আনন্দমোহন বসুর ছোট ভাই মোহিনীমোহন বসু জগদীশচন্দ্রের দেখাশুনার ভার নিলেন।

১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ষোল বছর বয়সে জগদীশচন্দ্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় পাশ করলেন কৃতিত্বের সঙ্গে। এর পর সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজেই ভর্তি হলেন। সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক ছিলেন ফাদার লাফোঁ। ক্লাসে ফাদার লাফোঁ হাতে-কলমে পরীক্ষা করে পদার্থবিদ্যার বিষয়জ্ঞান ব্যাখ্যা করতেন। এতে ছাত্ররা দারুণ ভাবে আকৃষ্ট হত। জগদীশচন্দ্রও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। ফাদার লাফোঁও জগদীশচন্দ্রকে সস্নেহে কাছে নিয়ে নিলেন। জগদীশচন্দ্র নিজের মেধা এবং অধ্যবসায়ের ফলে পরীক্ষার চৌকাঠগুলি একের পর এক অবলীলাক্রমে পার হয়ে গেলেন। তিনি ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে এফ. বি. এ. এবং ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে বি. এ. পাশ করেন। এই সব পরীক্ষায় বিজ্ঞান বিষয় এবং সংস্কৃতে জগদীশচন্দ্র বিশেষ পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন।

জগদীশচন্দ্র তখন যৌবনে পদার্পণ করেছেন। তিনি স্থির করলেন শিক্ষা-জীবনকে আরও উজ্জ্বল করে তোলবার জন্য বিলেত যাবেন। কিন্তু ভগবানচন্দ্রের আর্থিক সামর্থ্য তখন পড়তির দিকে। স্বাস্থ্যের কারণে সামান্য বেতনে দীর্ঘদিনের ছুটি নিয়েছেন, তাই বিলেতে পাঠাবার মত সচ্ছলতা তখন ভগবানচন্দ্রের ছিল না। জগদীশচন্দ্র বুঝলেন শিক্ষান্তে তাঁর প্রথম এবং প্রধান কর্তব্য হল পিতাকে আর্থিক দায় থেকে মুক্তি দেওয়া আর তার একমাত্র উপায় হল বিলেত গিয়ে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া। কিন্তু ভগবানচন্দ্র নিজে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়েও পুত্রের এই ইচ্ছায় সায় দিতে পারলেন না। তাঁর আশঙ্কা হল আই. সি. এস. হয়ে সরকারী চাকরি গ্রহণ করলে জগদীশচন্দ্র সাধারণ মানুষের সঙ্গে সংযোগ হারিয়ে ফেলবে। কারণ আই. সি. এস চাকুরেরা বিদেশী শক্তির প্রতিভূ। দেশের সাধারণ মানুষের স্বার্থ উপেক্ষা করে তাদেরকে বিদেশী শক্তির আজ্ঞাবহ হতে হয়। তখন জগদীশচন্দ্র প্রস্তাব দিলেন বিলেতে গিয়ে ডাক্তারি পড়বেন। এতে পিতার সায় পাওয়া গেল। কিন্তু অসুবিধা দেখা দিল

আর্থিক দিক থেকে। বিলেতে থাকা খাওয়ার খরচ কোথা থেকে আসবে? তখন স্থির হল জগদীশচন্দ্রের মায়ের কিছু অলঙ্কার বিক্রি করা হবে। কিন্তু মা বামাসুন্দরীও ছেলের বিলেত যদওয়াতে প্রথমটা মত দিতে পারলেন না। তাঁর ছোট ছেলেটি দশ বছর বয়সে মারা গেছে। জগদীশচন্দ্রই তাঁর একমাত্র ছেলে। সেই ছেলে এত দূরে বিলেত যাবে আর সেখানে এত দিন পড়ে থাকবে এ তাঁর কল্পনারও বাইরে। জগদীশচন্দ্র মায়ের আপত্তিতে ব্যথিত হলেন। তাঁর মানসিক অবস্থা বুঝতে পেরে অবশেষে জগদীশচন্দ্রের বিলেত যাতায়াতে মত দিলেন। মায়ের অলঙ্কার বিক্রি করতে হল না, কারণ ভগবানচন্দ্র ইতিমধ্যে সুস্থ হয়ে তাঁর স্বাভাবিক কাজে যোগ দিয়েছেন।

বিলেতে যাত্রা

১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে জগদীশচন্দ্র বিলেতের পথে পাড়ি দিলেন। কিন্তু সমুদ্রযাত্রা জগদীশচন্দ্রের বিশেষ সুখের হল না। বিলেত যাত্রার কিছুদিন আগে এক জমিদার বন্ধুর অনুরোধে আসামে গিয়েছিলেন বাঘ শিকার করতে। আসামে পৌঁছনর দ্বিতীয় দিনেই জগদীশচন্দ্র কালাজ্বরে আক্রান্ত হলেন। জ্বর এমন সাংঘাতিক হয়ে দাঁড়াল যে সকলেই তাঁকে কলকাতায় ফিরে যাবার পরামর্শ দিলেন। সেই সময় কোন গাড়ি বা পাল্কি পাওয়া গেল না। অত্যন্ত অসুস্থ অবস্থায় কেবল মাত্র দৃঢ় মনোবল সম্বল করে জগদীশচন্দ্র রেসের এক অবাধ্য ঘোড়ায় চড়ে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে কলকাতায় পৌঁছলেন। ইংলণ্ড যাত্রা করবার সময় পড়ন্ত জ্বর ছাড়ল না। সকলেই ভাবলেন সমুদ্র যাত্রায় জ্বর হয়ত সেরে যাবে। কিন্তু তা হয় নি। সমুদ্র যাত্রায় জাহাজের মধ্যে জগদীশচন্দ্রের জ্বর ক্রমশ বেড়েই চলল। জাহাজের মধ্যে ডাক্তারের কাছে দেখাতে গিয়ে একদিন তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন। ডাক্তার কোলে করে তাঁকে তাঁর বার্থে রেখে আসেন। তাঁর এই বিলেত যাত্রায় দুই জন মহিলা তাঁকে সাহচর্য ও সহানুভূতি

দিয়ে তাঁর রোগজ্বালা কিছুটা উপশম করার চেষ্টা করেছিলেন। এঁদের কথা জগদীশচন্দ্র চিরদিন মনে রেখেছেন।

রোগ জগদীশচন্দ্রকে নিজ সংকল্প থেকে বিচ্যুত করতে পারল না। লণ্ডনে তিনি মেডিক্যাল কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে ভর্তি হলেন। জুওলজি, বোটানি এবং অ্যানাটমি দিয়ে পড়াশুনা শুরু হল। কিন্তু শরীর গোলমাল করতে লাগল। মাঝেমধ্যেই জ্বর আসে। তখনকার দিনে কালাজ্বরের ওষুধও বার হয় নি। সুতরাং কোন ওষুধেই কোন কাজ হয় না। ডাক্তারি পড়ায় প্রচণ্ড খাটুনি। এ রকম শরীরে তা সহ্য হল না। অ্যানাটমির অধ্যাপক পরামর্শ দিলেন—ডাক্তারি পড়া ছেড়ে দাও। মেডিসিনের নামকরা অধ্যাপক ডক্টর বিঙ্গার অনেক ওষুধপত্র দিয়েও জগদীশচন্দ্রের রোগ সারাতে পারলেন না। তিনিও পরামর্শ দিলেন—ডাক্তারি পড়া ছেড়ে দাও।

অগত্যা জগদীশচন্দ্র ঠিক করলেন যে তিনি লণ্ডন শহর ছেড়ে দেবেন. কেম্ব্রিজে গিয়ে বিজ্ঞান পড়বেন, আনন্দমোহন বসু ছিলেন কেম্ব্রিজের প্রথম ভারতীয় "র‍্যাংলার"। তাঁর একটা সুপারিশ নিয়ে জগদীশচন্দ্র কেম্ব্রিজের বিখ্যাত ক্রাইস্টস কলেজে ভর্তি হলেন ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে।

তখনকার লণ্ডনের ধুলো ও কুয়াশার আবহাওয়া ছেড়ে দিয়ে কেম্ব্রিজের নির্মল আবহাওয়ার পরিবেশে জগদীশচন্দ্র স্বস্তি পেলেন। তাঁর স্বাস্থ্য আগের থেকে ভাল হল, কিন্তু নিয়মিত জ্বর আসা বন্ধ হল না। কেম্ব্রিজে জগদীশচন্দ্র মাঝে মাঝে নৌকো বাইতে আরম্ভ করলেন। তাতে তাঁর প্রচুর পরিশ্রম হতে লাগল। এর জন্য ক্ষুধাও বাড়ল। শরীর আগের থেকে সুস্থ হয়ে উঠল। কিন্তু জ্বর কিছুতেই যায় না।

প্রথম প্রথম সপ্তাহে একবার জ্বর হতে লাগল। তারপর দুসপ্তাহে একবার। ইংলণ্ড প্রবাসের দ্বিতীয় বছরে জগদীশচন্দ্র সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলেন। প্রথম বছর কেম্ব্রিজে জগদীশচন্দ্র ধীরে ধীরে

বিজ্ঞানের পাঠ নিলেন। শরীরের কারণে এই সময় কারও সঙ্গে মিশতে ভাল লাগত না। দ্বিতীয় বছরে জগদীশচন্দ্র পূর্ণ কর্মোদ্যম ফিরে পেলেন। এখন থেকে তিনি কলেজে অপর ছাত্রদের সঙ্গে মেলামেশা করতে লাগলেন। কলেজের বাইরেও তাঁর যাতায়াত শুরু হল। একটা প্রকৃতি-বিজ্ঞান ক্লাবে যোগ দিলেন। সেখানে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ পাঠ এবং বিজ্ঞান-বিষয়ক আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতে লাগলেন। এইভাবে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান পথিকৃতের ভবিষ্যৎ জীবনের প্রস্তুতি শুরু হল।

বিজ্ঞান নিয়ে পড়তে শুরু করলেও বিজ্ঞানের কোন্ শাখায় পড়বেন প্রথমটা তা ঠিক করতে পারেন নি জগদীশচন্দ্র। বিজ্ঞানের সব বিষয়েই তাঁর ভাল লাগে। তিনি ঠিক করলেন বিজ্ঞানের সব বিষয়েই সব অধ্যাপকের ক্লাশে যোগ দেবেন। আর যতগুলি সম্ভব পরীক্ষাগারে হাতেকলমে পরীক্ষা করবেন। শারীরবিদ্যায় জগদীশচন্দ্রের অধ্যাপক মাইকেল ফস্টার ছিলেন একজন বিশেষজ্ঞ। ভ্রূণবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন অধ্যাপক বালফুর। জিওলজি সম্বন্ধে জগদীশচন্দ্র পাঠ নিতেন নামকরা অধ্যাপক হিউয়েস এবং তাঁর স্ত্রীর কাছে। কেম্ব্রিজের বিজ্ঞানী মহলে এই সব প্রতিথযশা বিজ্ঞানীদের নাম তখন মুখে মুখে ফিরত। এঁদেরই সাহচর্য পেয়ে জগদীশচন্দ্র তাঁর জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ করে তোলেন।

কেম্ব্রিজে দ্বিতীয় বর্ষের মাঝামাঝি সময় থেকে জগদীশচন্দ্র তাঁর পাঠ্য বিষয় পাকাপাকি নির্দিষ্ট করে নিলেন পদার্থবিজ্ঞান (**Physics**), রসায়ন (**Chemistry**) এবং উদ্ভিদ বিজ্ঞান (**Botany**), পদার্থ-বিজ্ঞান পড়াতেন লর্ড ব্যালে, রসায়ন পড়াতেন লিভিং এবং উদ্ভিদ-বিজ্ঞান পড়াতে ভাইন্‌স্ এবং ফ্রান্সিস ডারউইন। এঁরা সকলেই ছিলেন আপন আপন ক্ষেত্রে এক একটি দিক্‌পাল। কেম্ব্রিজে বিজ্ঞান কলেজে জগদীশচন্দ্র যে রকম উদ্যম ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন করেছেন তাতে তাঁর অধ্যাপকগণ তাঁর উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট

ছিলেন। অধ্যাপক র‍্যালে এবং অধ্যাপক ভাইন্‌স্‌ এঁদের দুজনের সঙ্গেই জগদীশচন্দ্রের বন্ধুত্ব এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। পরবর্তী কালে মৌলিক গবেষণার ব্যাপারে জগদীশচন্দ্র যখন পশ্চাত্যে প্রচণ্ড বাধার সম্মুখীন হয়েছিলেন তখন এই দুই জন সুহৃদ অধ্যাপক তাঁকে সস্নেহে বার বার সমর্থন জানিয়েছিলেন। তিন বছর পর জগদীশচন্দ্র কেম্ব্রিজ থেকে "ট্রাইপস্‌" পাশ করলেন এবং প্রায় একই সঙ্গে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি. এস সি. ডিগ্রীও পেলেন। বিলেতের পাঠ সাঙ্গ হল। এবার দেশে ফেরার পালা।

স্বদেশে প্রত্যাবর্তন

এখন জগদীশচন্দ্রের বয়স প্রায় পঁচিশ বছর। দীর্ঘ চার বছর তিনি প্রবাসে ছিলেন। ইতিমধ্যে ভগবানচন্দ্রের আর্থিক অবস্থার তেমন একটা হেরফের হয় নি। পিতাকে কিছুটা স্বস্তি দেওয়ার প্রয়োজন। আনন্দমোহন বসুর সাহায্য নিয়ে জগদীশচন্দ্র বিলেতে দেখা করলেন সেখানকার তৎকালীন পোষ্টমাষ্টার জেনারেল এবং প্রভাবশালী ব্যক্তি ফসেটের সঙ্গে। ফসেট জগদীশচন্দ্রকে একখানি সুপারিশ পত্র দিয়ে ভারতে তখনকার গভর্নর জেনারেল লর্ড রিপণের সঙ্গে দেখা করতে বললেন।

প্রেসিডেন্সী কলেজে

দেশে ফিরে রিপণের সঙ্গে দেখা করলেন জগদীশচন্দ্র। লর্ড রিপণ বাংলার শিক্ষা অধিকর্তা স্যার আলফ্রেড ক্রফ্‌ট্‌কে অনুরোধ করলেন জগদীশচন্দ্রকে শিক্ষা দপ্তরে উপযুক্ত অধ্যাপক পদে নিয়োগ করতে। তখনকার দিনে শাসক ইংরেজদের বেশীর ভাগ ব্যক্তিরই ধারণা ছিল যে ভারতীয়রা বিজ্ঞান বিষয়ে অধ্যাপনা করতে পারবে না। ক্রফ্‌ট্‌ সাহেবেরও সেইরকম ধারণা ছিল। তিনি লর্ড রিপণের সুপরিশ পেয়ে খুশী হলেন না। সে সময়ে শিক্ষা বিভাগে দুরকম চাকরি হত— ইম্পিরিয়াল সার্ভিস এবং প্রভিন্সিয়াল সার্ভিস। ইম্পিরিয়াল সার্ভিসের

মান ও মর্যাদা প্রভিন্সিয়াল সার্ভিসের মান ও মর্যাদার তুলনায় অনেক বেশী। ক্রফ্‌ট্ সাহেব জগদীশচন্দ্রকে প্রভিন্সিয়াল সার্ভিসেই নিযুক্ত করতে চাইলেন। প্রেসিডেন্সী কলেজের তৎকালীন প্রিন্সিপ্যাল চার্লস টনিও বাধ সাধলেন। জগদীশচন্দ্র প্রস্তাবিত পদ গ্রহণে অস্বীকৃত হলেন। গেজেটে জগদীশচন্দ্রের নাম না দেখে লর্ড রিপণ ক্রফ্‌ট্ সাহেবের কাছে কারণ জানতে চাইলেন। উপায়ান্তর না দেখে শিক্ষা অধিকর্তা জগদীশচন্দ্রকে ইম্পিরিয়াল সার্ভিসেই অধ্যাপক পদে নিয়োগ করলেন। কিন্তু পদটি করে দিলেন অস্থায়ী, বেতনও ঠিক করে দিলেন সমপদে নিযুক্ত ইউরোপীয় ব্যক্তির বেতনের এক-তৃতীয়াংশ। শুধু তাই নয়, জগদীশচন্দ্র এর পর যখন স্থায়ী পদ পাবেন, তখনও তাঁর বেতন হবে ইউরোপীয় ব্যক্তির বেতনের দুই-তৃতীয়াংশ। যেকোন আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি এই ব্যবস্থা কিছুতেই মেনে নিতে পারেন না। জগদীশচন্দ্রও পারলেন না। তিনি ঐ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন। অন্যায়ের প্রতিবাদ স্বরূপ জগদীশচন্দ্র বেতন নেওয়া বন্ধ রাখলেন। তিন তিনটি বছর এইভাবে চলে গেল। অবশেষে সরকার নতি স্বীকার করল। তাঁকে ন্যায্য বেতনই দিলেন এবং তিন বছরের বকেয়া বেতনও জগদীশচন্দ্রকে দিয়ে দিলেন। একসঙ্গে বেশ কিছুটা অর্থ প্রাপ্তিতে জগদীশচন্দ্রের সুবিধাই হল। এই টাকায় তিনি ভগবানচন্দ্রের ঋণভার কিছুটা লাঘব করে দিলেন। এর পর ভগবানচন্দ্র মাত্র দুবছর বেঁচে ছিলেন।

সংসার জীবনে প্রবেশ

আনন্দমোহন বসু এবং দুর্গামোহন দাশ দুজনেই ভগবানচন্দ্রের আন্তরিক বন্ধু। এঁরা ছিলেন ব্রাহ্মসমাজের খ্যাতিমান পৃষ্ঠপোষক। আনন্দমোহন বসু ভগবানচন্দ্রের কন্যাকে বধূরূপে বরণ করেন। আর ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে দুর্গামোহন দাশের কন্যা অবলার সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হলেন জগদীশচন্দ্র। তখন অবলা মাদ্রাজে

ডাক্তারি অধ্যয়নরতা চতুর্থ বর্ষের ছাত্রী। বিয়ের পর কলকাতার অদূরে চন্দননগরে তাঁরা সংসার পাতলেন। থাকতেন "পাতালপুরী" নামে একটি বাড়ীতে। জগদীশচন্দ্র চন্দননগর থেকে নৌকোয় গঙ্গা পার হয়ে আসতেন নৈহাটি এবং সেখান থেকে ট্রেনে চেপে আসতেন কলকাতা। নৌকো বাইতেন অবলা। প্রকৃতপক্ষে অবলার মত পতিব্রতা মেয়ে তখন ছিল বিরল। অবলা প্রতিদিন নৈহাটির ঘাটে জগদীশচন্দ্রের জন্য অপেক্ষা করতেন। জগদীশচন্দ্রের খ্যাতি তখন সবে চারদিকে ছড়াতে শুরু করেছে।

শিক্ষাব্রতী জগদীশচন্দ্র

এখন যেমন তখনও তেমনি প্রেসিডেন্সি কলেজে দেশের সেরা ছাত্ররা পড়ত। তাদের কাছে নিজের বক্তব্য পেশ করে নিজেকে সফল অধ্যাপকরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে তখন অনেকেই হিমসিম খেতেন। তাই অন্যান্য অধ্যাপকের ক্লাশে ছাত্ররা থাকত অমনোযোগী, কখনও কখনও ক্লাশে আসতই না, কিন্তু জগদীশচন্দ্র ছিলেন এর ব্যতিক্রম। তাঁর কথা শুনবার জন্য তাঁর ক্লাশে উপস্থিত থাকবার জন্য ছাত্রদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে যেত। তাঁর ক্লাশের প্রধান আকর্ষণ ছিল বিজ্ঞান পাঠের বিষয়গুলির হাতেকলমে পরীক্ষা। এই সব পরীক্ষা করতে তরুণ বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র যেমন উৎসাহ পেতেন তেমনি উৎসাহ পেত.তাঁর ছাত্ররা। জগদীশচন্দ্রের ছাত্রদের মধ্যে অনেকে আছেন যাঁরা শিক্ষক এবং বৈজ্ঞানিক হিসেবে আজও ভারতবাসীর অন্তরে শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত। এঁদের মধ্যে নাম করতে হয় মেঘনাথ সাহা, সত্যেন বোস, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতির। এঁরা ছিলেন উপযুক্ত শিক্ষকের উপযুক্ত ছাত্র।

জগদীশচন্দ্রের উপর বন্ধু প্রফুল্লচন্দ্রের প্রভাব

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ছিলেন প্রেসিডেন্সি কলেজে জগদীশচন্দ্রের সহকর্মী এবং বন্ধু। দেশপ্রেমী, প্রতিভাবান এবং অকৃতদার প্রফুল্ল-

চন্দ্রের প্রতি জগদীশচন্দ্রের ছিল সহজাত শ্রদ্ধা। বিলেতের এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করে প্রফুল্লচন্দ্র ডি. এস. সি উপাধি লাভ করেন এবং কলকাতায় ফিরে এসে প্রেসিডেন্সি কলেজে বিজ্ঞান বিভাগে অধ্যাপক রূপে যোগদান করেন। প্রফুল্লচন্দ্র যখন এডিনবরায় জগদীশচন্দ্র তখন কেম্ব্রিজে। কলকাতায় ফেরার পথে প্রফুল্লচন্দ্র কিছুদিন জগদীশচন্দ্রের কাছে থেকে যান। প্রফুল্লচন্দ্রের ডক্টরেট হয়ে ফেরার পর জগদীশচন্দ্র পদার্থবিদ্যায় গবেষণা করবেন বলে মনস্থির করেন এবং ঠিক করেন যে বিদেশে নয় স্বদেশেই ওই গবেষণা চালাবেন।

কিন্তু তখনকার দিনে কলকাতা তথা ভারতবর্ষে বসে গবেষণার যন্ত্রপাতি তৈরী করা ছিল কল্পনাতীত। উপযুক্ত মিস্ত্রি কোথায় যে নির্দেশ দিলেই যন্ত্র তৈরী করে দেবে? কিন্তু মনে দৃঢ় ইচ্ছা থাকলে কোন প্রতিবন্ধকই দমাতে পারে না। জগদীশচন্দ্র নিজের প্রয়োজনের যন্ত্রপাতি নিজেই তৈরী করতে অগ্রসর হলেন। ১৮৯৬ সালে জার্মানীতে এক্স-রে আবিষ্কৃত হওয়ার কয়েক মাসের মধ্যেই জগদীশচন্দ্র প্রেসিডেন্সি কলেজে এক্স-রে যন্ত্র তৈরী করে ফেলেন।

বিজ্ঞানী ম্যাক্সওয়েল এবং হার্জের বিদ্যুৎ তরঙ্গ বিষয়ে গবেষণা এবং জগদীশচন্দ্র

জগদীশচন্দ্রের সমকালীন ইংলণ্ডের নামকরা বিজ্ঞানী ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল বিদ্যুৎ তরঙ্গ বিষয়ে কিছু তথ্য প্রকাশ করলেন। এই তথ্যের উপর ভিত্তি করে আর এক নামকরা বিজ্ঞানী জার্মানীর হাইনরিখ হার্জ ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্যুৎ তরঙ্গ সৃষ্টি করলেন। এই ঘটনা পৃথিবীর বিজ্ঞানী মহলে দারুণ সাড়া জাগাল। অনেকদিন আগে থেকেই বিজ্ঞানীরা কল্পনা করেছিলেন যে আলো একরকম শক্তির তরঙ্গ। কিন্তু এই তরঙ্গের বাহক কি? পৃথিবীর উপর বাতাস অল্পদূর গিয়ে শেষ হয়েছে। তা হলে লক্ষ কোটি মাইল দূরে যে চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ রয়েছে তাদের আলো আমাদের পৃথিবীতে পৌঁছায় কোন্

বাহকের মাধ্যমে। বিজ্ঞানীরা এই কল্পিত বাহকের নাম দিলেন "ঈথর"। ধরে নেওয়া হল যে ঈথর কাঁপে। তরঙ্গ সৃষ্টি হলে তা সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল বেগে ধাবিত হয় এবং এই তরঙ্গ আমাদের চোখে আলো রূপে প্রতিভাত হয়। বায়ুর কম্পনাঙ্ক যেমন একটা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে থাকলেই তবে তা আমাদের কানে শব্দরূপে প্রতিভাত হয় তেমনি আলোর কম্পনাঙ্কও। সকল কল্পন আমাদের চোখে আলোর অনুভূতি জাগায় না। সেকেণ্ডে চারশ লক্ষ কোটি কম্পন লাল আলোর অনুভূতি জাগায়। এর দ্বিগুণ সংখ্যক কম্পন বেগুনী আলো রূপে আমাদের চোখে প্রতিভাত হয়। অন্যান্য রঙের আলোর কম্পন সংখ্যা এই দুই সীমার মধ্যে। কম্পন সংখ্যার পরিবর্তে যদি তরঙ্গের দৈর্ঘ্যকে আলোর রঙের মাপকাঠি হিসাবে ধরা হয় তবে লাল আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য দাঁড়ায় এক ইঞ্চির পঁচিশ হাজার ভাগের এক ভাগ। বেগুনী রঙের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য দাঁড়ায় এরও অর্ধেক।

হার্জ সাধারণ আলোর খোঁজ না করে চেষ্টা করলেন "অদৃশ্য রশ্মি" ধরবার জন্য। হার্জের তৈরি করা যন্ত্রে অদৃশ্য আলো তরঙ্গ ধরা পড়ল। বিজ্ঞানের এই নবতম আবিষ্কার পৃথিবীর সমকালীন অনেক বিজ্ঞানীকে আকৃষ্ট করল। বিজ্ঞানের পথিকৃৎ জগদীশচন্দ্রও কলকাতায় হার্জীয় তরঙ্গ নিয়ে গবেষণা শুরু করলেন।

প্রেসিডেন্সি কলেজে হার্জিয় তরঙ্গ নিয়ে গবেষণা

নব আবিষ্কৃত তরঙ্গে যে সাধারণ আলোর সব ধর্মই থাকে তা প্রমাণ করবার জন্য জগদীশচন্দ্র অগ্রসর হলেন। সেটা ১৮৯৪ সালের কথা। কলকাতায় বসে প্রয়োজন মাফিক যন্ত্র করান ছিল অত্যন্ত কঠিন। তবুও জগদীশচন্দ্রের অদম্য উৎসাহে তাঁরই দেওয়া নকসামাফিক তৈরি হল বিদ্যুৎ রশ্মি সৃষ্টি করবার যন্ত্র। ওই যন্ত্রকে বলা হল প্রেরক যন্ত্র এবং সেই রশ্মিকে দূরে ধরবার জন্য তৈরি হল গ্রাহক যন্ত্র।

১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে জগদীশচন্দ্র প্রেসিডেন্সি কলেজে তাঁর প্রেরক যন্ত্রে বিদ্যুৎ তরঙ্গ সৃষ্টি করলেন এবং প্রায় সত্তর ফুট দূরে সহকর্মী

অধ্যাপক আলেকজাণ্ডার পেডলারের ঘরে সেই তরঙ্গ গিয়ে পৌঁছাল। কিছুদিন পর কলকাতার টাউন হলে জগদীশচন্দ্র একই পরীক্ষা করে তৎকালীন বিজ্ঞানী সমাজকে অবাক করে দিলেন। এই সময় থেকেই অদৃশ্য বিদ্যুৎ রশ্মির এক সম্ভাবনাপূর্ণ ভবিষ্যৎ জগদীশচন্দ্রের মনের কোণে ভেসে উঠেছিল।

সস্ত্রীক লণ্ডন গমন এবং মৌলিক আবিষ্কার বিষয়ে বিদ্বৎ সমাজে বক্তৃতা

১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার ছোটলাট ম্যাকেঞ্জির সামনে জগদীশচন্দ্র পরীক্ষা প্রদর্শন করলেন। ছোটলাট এতে বিস্মিত এবং মুগ্ধ হলেন। তিনি বিনা দ্বিধায় জগদীশচন্দ্রকে বিলাত যাবার অনুমতি দিলেন। জগদীশচন্দ্র সস্ত্রীক লণ্ডনে এসে পৌঁছলেন। তাঁর মৌলিক গবেষণা-লব্ধ জ্ঞান বিলেতের পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হতে লাগল। লণ্ডনের রয়াল ইনস্টিটিউশন দ্বারা আমন্ত্রিত হয়ে জগদীশচন্দ্র ওই ইনস্টিটিউশনে তাঁর মৌলিক আবিষ্কার সম্বন্ধে বক্তৃতা করে উপস্থিত বিজ্ঞানীদের মুগ্ধ করলেন। প্রখ্যাত বিজ্ঞানী কেলভিন জগদীশচন্দ্রের বক্তৃতা শুনে জগদীশচন্দ্রের স্ত্রী অবলাদেবীকে ব্যক্তিগত অভিনন্দন জানালেন স্বামীর মৌলিক আবিষ্কারের জন্য। পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানীগণ একবাক্যে বিজ্ঞান বিষয়ে জগদীশচন্দ্রের অসাধারণ প্রতিভার কথা স্বীকার করে নিলেন।

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে অবস্থানের শেষ দিকে জগদীশচন্দ্র আমন্ত্রিত হলেন প্যারিসের ফিজিকাল সোসাইটিতে বক্তৃতা করবার জন্য। বার্লিনের নামকরা বিজ্ঞানীগণও জগদীশচন্দ্রকে আমন্ত্রণ জানালেন তাঁদের দেশে বক্তৃতা করবার জন্য। প্যারিসের ফিজিকাল সোসাইটি জগদীশচন্দ্রের বক্তৃতায় মুগ্ধ হয়ে তাঁকে সেই সোসাইটির অবৈতনিক সভ্য করে নিলেন।

বার্লিনে অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সের সভায় জগদীশচন্দ্র বক্তৃতা করলেন। এরা জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার মুদ্রিত করে প্রকাশ করলেন।

হিডেলবার্গে নামকরা অধ্যাপক কুইঙ্কি একই বিষয়ে গবেষণা করতেন। জগদীশচন্দ্রের বক্তৃতা শুনবার জন্য তিনি হিডেলবার্গ থেকে বার্লিনের সভায় এসে উপস্থিত হলেন জগদীশচন্দ্রকে তাঁর গবেষণাগার দেখাবার জন্য তিনি হিডেলবার্গে আমন্ত্রণ জানালেন। কিল বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও বক্তৃতা করবার আমন্ত্রণ এল। কিল বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা করে জগদীশচন্দ্র এবারকার মত ইউরোপ ভ্রমণ শেষ করলেন। তিনি মার্সেলিস হয়ে স্বদেশ অভিমুখে যাত্রা করলেন।

মৌলিক গবেষণার দ্বিতীয় পর্ব

জগদীশচন্দ্র বিদ্যুৎ তরঙ্গের সাড়া পাবার জন্য যে গ্রাহক যন্ত্র উদ্ভাবন করেছিলেন তাতে দেখা গেল অনেকক্ষণ ধরে কাজ করতে করতে ওই যন্ত্রের সাড়া দেওয়ার পরিমাণ কমে আসছে, কিন্তু যন্ত্র চিরদিনের মত অকেজো হয়ে যাচ্ছে না। কয়েক ঘণ্টা ব্যবহার না করলে যন্ত্রটি কিন্তু আগের মতই সাড়া দেয়।

এর থেকে জগদীশচন্দ্র সিদ্ধান্ত করলেন যে ঠিক যেমন প্রাণীর শরীর কোষ কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর তার কর্মশক্তি ফিরে পায় তেমনি অজৈব গ্রাহক যন্ত্রও কিছুকাল বিশ্রামের পর তার কর্মশক্তি ফিরে পায়। কিন্তু পাশ্চাত্ত্যদেশের তৎকালীন বিজ্ঞানীসমাজ জড় এবং জীবের মধ্যে এই সাদৃশ্য কিছুতেই মেনে নিতে রাজি হলেন না। তাঁরা বললেন বিদ্যুৎ পরিচালনা করলে জীবপেশীতেই টান ধরে। আবার জীবপেশীতে যদি আঘাত করা যায় তবে জীবপেশীতে খানিকটা বিদ্যুৎ-চাপ সৃষ্টি হয়। পেশীর রোধ কমে যায়। ফলে পেশীতে আঘাত করলে বিদ্যুৎপ্রবাহের বেশি কম হওয়ায় বৈদ্যুতিক সাড়া পাওয়া সম্ভব। এটা দেখবার জন্য জগদীশচন্দ্র যে "চৌম্বক লিভার রেকর্ডার" যন্ত্র উদ্ভাবন করেছিলেন তার রেখাচিত্র নিচে দেওয়া হল।

শারীরতত্ত্ববিদরা আঘাতের ফলে বৈদ্যুতিক সাড়া দেবার ক্ষমতাকেই

বলতেন জীবনের প্রধান লক্ষণ। তখনকার দিনের নামকরা শারীর-তত্ত্ববিদ ডাঃ ওয়ালা এই মতের ছিলেন প্রবক্তা। জগদীশচন্দ্র দেখালেন যে তাঁর তৈরি গ্রাহক যন্ত্রে বিদ্যুৎস্রোতের আঘাতে সংযোগবিন্দুগুলিতে রোধের কম-বেশী হচ্ছে। তাইতেই গ্রাহকযন্ত্রের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। তা হলে ওই দ্রব্যের মধ্যে জীবনের ধর্ম রয়েছে বলতে আপত্তি কোথায় ?

শারীরতত্ত্ববিদদের যুক্তি অনুসারে জগদীশচন্দ্র চিন্তা করতে লাগলেন অজৈব পদার্থে আঘাত করে বা মোচড় দিয়ে তাতে সামান্য বিদ্যুৎ-চাপের জন্ম দেওয়া যায় কিনা। এর জন্য তিনি "স্ট্রেইন-সেল" নামে এক যন্ত্র উদ্ভাবন করলেন।

এতে ছিল দুটি টিনের তার, ইবোনাইটের ফ্রেমে বাঁধা, খাঁড়াভাবে পাশাপাশি ঝোলান। কাচের পাত্রে রক্ষিত ছিল পরিশ্রুত জল। দুটি তারের মধ্যে কোন সংযোগ ছিল না, ব্যবস্থা এমন ছিল একটি তারকে স্থির অবচয় রেখে অপর তারকে মোচড়ান যায়। দুইটি তারকে গ্যাল-ভানোমিটারের সঙ্গে লাগান হল। জগদীশচন্দ্র বাইরের হাতল ধরে একটি তারকে সম্পূর্ণ মুচড়ে দিলেন। দেখা গেল গ্যালভানোমিটারের কাঁটা নড়ে গেল। এইভাবে জগদীশচন্দ্র প্রমাণ করলেন যে ধাতব তারে মোচড় দেওয়ার ফলেই বিদ্যুৎ শক্তির জন্ম হল। তা হলে যান্ত্রিক পীড়ন এবং অদৃশ্য বিদ্যুৎ তরঙ্গাঘাত, ধাতব বস্তুতে এই দুইয়ের ফল একই রকম। উভয়ক্ষেত্রেই বিদ্যুৎচাপের সৃষ্টি হয় এবং রোধ কম বা বেশি হয়।

আরও একটা বিস্ময়কর ব্যাপার তিনি পরীক্ষা করে দেখালেন। বাইরে থেকে নানারকম উত্তেজনা সৃষ্টি করলে অর্থাৎ উত্তপ্ত করলে বা নানারকম উত্তেজক অথবা অবসাদঘটানোর ওষুধ প্রয়োগ করলে জীব-কলায় সাড়ার মাত্রা কম বেশি হয়। জগদীশচন্দ্র "স্ট্রেইন সেলে"র জলে বিষাক্ত জিনিস মেশালেন। দেখা গেল ধাতব তারকে মোচড়ালে আর সাড়া দিচ্ছে না। জল পাল্টে নতুন জল ব্যবহার করলেন। দেখা গেল গ্যালভানোমিটারের কাঁটা আগের মতই নড়ে উঠছে। জলের বদলে অধিকতর উত্তেজক অ্যালকোহল ব্যবহার করলেন। দেখা

গেল গ্যালভানোমিটারের কাঁটা আগের থেকে বেশি নড়ে উঠছে। একটি তারে নানা রঙের আলো ফেলেও দেখা গেল সাড়ার তারতম্য ঘটছে। এই ঘটনা থেকে জগদীশচন্দ্র স্থির সিদ্ধান্ত করলেন যে পদার্থ-বিদ্যার শেষ এবং প্রাণীবিদ্যার শুরু বলে কিছু নেই।

প্যারিসের আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান কংগ্রেসে জগদীশচন্দ্র

তখন সময়টা ছিল ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ। জগদীশচন্দ্র ৪২ বছরের যুবক। আমন্ত্রণ এল প্যারিসের আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান কংগ্রেসে যোগদানের। বাংলার লেফটেনাণ্ট গভর্ণর তখন স্যার জন উড্‌বার্ণ। জগদীশচন্দ্র জানতেন শিক্ষাবিভাগ তাঁকে প্যারিসে যাবার অনুমতি দেবে না। তিনি সরাসরি দেখা করলেন উড্‌বার্ণের সাথে। জগদীশচন্দ্র জড় ও জীব সম্বন্ধে যে নতুন তথ্য আবিষ্কার করেছিলেন সেই ব্যাপারে উড্‌বার্ণ অবহিত ছিলেন। উড্‌বার্ণের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় শিক্ষাবিভাগ জগদীশচন্দ্রকে প্যারিসে যাবার অনুমতি দিলেন এবং ছুটি মঞ্জুর করলেন।

কিন্তু বাধা হয়ে দাঁড়াল অর্থের অপ্রতুলতা। এগিয়ে এলেন বাংলা তথা ভারতবর্ষের আর এক প্রতিথযশা ব্যক্তিত্ব কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বকবির সঙ্গে দার্শনিক বিজ্ঞানীর সম্পর্ক ছিল বন্ধুত্বের। কবিগুরুই জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন তৎকালীন ত্রিপুরাধিপতির। তিনিই জগদীশচন্দ্রকে প্রয়োজনীয় অর্থ দিলেন।

১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসের শেষ দিক। ভারতবর্ষ তথা প্রাচ্যের প্রতিনিধি হয়ে জগদীশচন্দ্র সস্ত্রীক প্যারিসে এলেন। তাঁর বক্তৃতার বিষয় ছিল "যান্ত্রিক এবং বৈদ্যুতিক তাড়নায় জড় ও জীবিত বস্তুর মধ্যে প্রতিক্রিয়ার সমতা।" তাঁর নিজের তৈরি "চৌম্বক লিভার রেকর্ডার" যন্ত্রের সাহায্যে তিনি তাঁর বক্তৃতার বিষয়বস্তু পরীক্ষা করে দেখালেন যে একই পীড়ন অথবা বৈদ্যুতিক চাপে জড় এবং জীব-

কোষ একই প্রকার সাড়া দেয়। দেখা গেল তাঁর উদ্ভাবিত যন্ত্রে জড় এবং জীবের পীড়নের ক্ষেত্রে একই রকম রেখাচিত্র অঙ্কিত হয়ে যাচ্ছে।

এই ঘটনায় পৃথিবীর বিজ্ঞানীমহল স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। ভারতবর্ষের আর এক মনীষী তখন প্যারিসে। তাঁর নাম স্বামী বিবেকানন্দ। স্বামীজি ওই সভাতে উপস্থিত থেকে তাঁরই দেশের আর এক মনীষীকে দেখলেন পৃথিবীর বিজ্ঞানীমহল কর্তৃক অভিনন্দিত হতে। এই ঘটনায় স্বামীজি অভিভূত হয়ে পড়লেন এবং জগদীশচন্দ্রের উপর আশীর্বাদ বর্ষণ করতে লাগলেন।

ইংলণ্ডের রয়াল ইনস্টিটিউশনে আমন্ত্রিত হলেন জগদীশচন্দ্র। প্যারিস থেকে তিনি চলে এলেন লণ্ডনে। তাঁর বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল যান্ত্রিক ও বৈদ্যুতিক পীড়নে জড়পদার্থের সাড়া। বক্তৃতা দেবার আগে জগদীশচন্দ্র প্রায় তিন মাস সময় পান হাতে। ঐ সময়টা জগদীশচন্দ্র রয়াল ইনস্টিটিউশনের ডেভি-ফ্যারাডে ল্যাবরেটরিতে গবেষণা করলেন। ওই ল্যাবরেটরিতেই তিনি প্রাণীজ কোষ এবং ধাতুর সঙ্গে সর্বপ্রথম গাছের অংশও ব্যবহার করেন।

গাছের অংশটিতে মোচড় প্রয়োগ করার ব্যবস্থা ছিল। বিভিন্ন ধরনের বিযাক্ত গ্যাসও কাচের কক্ষটিতে ঢুকিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা রাখা ছিল। মোচড় প্রয়োগ করার ফলে সৃষ্ট বিদ্যুৎপ্রবাহ গ্যাল-ভানোমিটার যন্ত্রে রেকর্ড করার ব্যবস্থা ছিল। ওই বিদ্যুৎতের পরিমাপের কম বেশি "রেসপন্স রেকর্ডার" নামক যন্ত্রে লিপিবদ্ধ হয়ে যেত। জগদীশচন্দ্র তাঁর যন্ত্রে অন্যান্য গাছের অংশ ব্যবহার করে একই রকম ঘটনা প্রত্যক্ষ করেন।

সেই দিন ছিল শুক্রবার। ১০ই মে, ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দ সন্ধ্যা ৯টা, স্থান ইংলণ্ডের রয়াল ইনস্টিটিউশন। সভাগৃহের দরজা খোলা হল। অবলাদেবীকে নিয়ে ইনস্টিটিউশনের সভাপতি সভায় প্রথম প্রবেশ করলেন। তাঁদের পিছনে খ্যাতনামা বিজ্ঞানীগণ। সব শেষে প্রবেশ করলেন জগদীশচন্দ্র। উপস্থিত ব্যক্তিগণ আচার্য এবং আচার্য পত্নীকে

সাদর এবং উষ্ণ অভ্যর্থনা জানালেন। জগদীশচন্দ্র শান্তভাবে কিন্তু প্রত্যয়ের সঙ্গে একে একে তাঁর বক্তব্য উপস্থাপিত করলেন। তিনি দেখালেন জীবিত কোষের উপর মোচড় প্রয়োগ করলে যে ধরনের বৈদ্যুতিক সাড়া পাওয়া যায়, একই স্থানে টিনের তারকে মোচড় দিলে একই রকমের সাড়া পাওয়া যায়। শুধু তাই নয় উদ্ভিজ কোষে উত্তেজক বা অবসাদক দ্রব্য প্রয়োগ করলে যেমন সাড়ার মাত্রা কম বা বেশি হয় তেমনি টিনের তারের উপর ওই দ্রব্য প্রয়োগ করলে একই রকম ভাবে সাড়ার মাত্রা বাড়ে বা কমে। বিষপ্রয়োগে কোষের সাড়া স্তব্ধ হয়ে গেল। তেমনি বিষপ্রয়োগে টিনের তারের সাড়াও লোপ পেল।

জগদীশচন্দ্র দেখালেন যে জীবিত কোষেতে যেমন ক্লান্তির লক্ষণ দেখা যায় টিনের তারেও ঠিক তেমনি অবসাদ লক্ষ্য করা যায়। জগদীশচন্দ্রের বক্তব্য শুনে এবং হাতেকলমে সেই বক্তব্যের সমর্থনে পরীক্ষা দেখে উপস্থিত জ্ঞানী শ্রোতৃমণ্ডলী অভিভূত হয়ে পড়লেন। ইউরোপবাসীরা স্বীকার করলেন যে ভারতীয়রা কেবল কল্পনাবিলাসীই নন, আধুনিক বিজ্ঞানেও তাঁরা অসামান্য প্রতিভার স্বাক্ষর রাখতে পারেন, কঠিন বিরোধিতার মুখোমুখি।

ডেভি-ফ্যারাডে ল্যাবরেটরিতে কাজ করবার আগেই জগদীশচন্দ্র তখনকার প্রখ্যাত শারীরতত্ত্ববিদ ডঃ এ. ডি. ওয়ালারের সঙ্গে পরিচিত হন। ডঃ ওয়ালার তখন এটা প্রমাণ করতে ব্যস্ত যে বৃক্ষেরও অনুভূতি আছে। বীজ রোপণের কয়েক দিন পর থেকেই অনুভূতি শক্তি ক্রমশ প্রকাশ পেতে থাকে। কিন্তু তখনকার দিনের অন্যান্য শারীর-তত্ত্ববিদরা ওয়ালারের এই বক্তব্য মানতে রাজি হচ্ছিলেন না। ওয়ালারের সঙ্গে পরিচয়সূত্রেই জগদীশচন্দ্র এই সব কথা জানতে পারেন। তাই ডেভি-ফ্যারাডের ল্যাবরেটরিতে কাজ করবার সময় জগদীশচন্দ্রও গাছের অংশ নিয়ে বৈদ্যুতিক সাড়া পাবার কাজ শুরু করেন।

তখনকার শারীরতত্ত্ববিদরা এটা মানতেন যে প্রাণিদেহের কোন অংশে উত্তেজনা সৃষ্টি করলে শারীরবৃত্তের নিয়মে তার অবস্থার

পরিবর্তন ঘটে এবং দেহাংশের বৈদ্যুতিক সাড়ারও পরিবর্তন ঘটে। কিন্তু গাছের মধ্যে বৈদ্যুতিক সাড়ার ব্যাপারটা তাঁদের কাছে ছিল অভিনব। তবে প্রখ্যাত শারীরতত্ত্ববিদ স্যার জন বার্ডন স্যাণ্ডারসন পতঙ্গভুক উদ্ভিদে একরকমের সাড়ার কথা স্বীকার করতেন, কিন্তু সমস্ত রকম উদ্ভিদে যে এ ধরনের বৈদ্যুতিক সাড়া থাকতে পারে তা তিনি বা অন্যান্য শারীরতত্ত্ববিদগণ কিছুতেই মানতে রাজি ছিলেন না।

অপর দিকে ওয়ালার বিশ্বাস করতেন না যে জড়পদার্থে বা অজৈব ধাতুতে উদ্ভিদের মতই বৈদ্যুতিক সাড়া পাওয়া সম্ভব। কিন্তু জগদীশচন্দ্র প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে অনুভূতির সাড়া জড়ের মধ্যেও প্রচ্ছন্ন রয়েছে। এখানেই জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে শারীরতত্ত্ববিদ বার্ডন স্যাণ্ডারসন এবং ওয়ালারের প্রচণ্ড মতপার্থক্য ঘটল। ওয়ালার জগদীশচন্দ্রের বক্তব্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে উঠে পড়ে লাগলেন।

সিড্‌নি ভাইন্‌স ছিলেন কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদ বিজ্ঞানের অধ্যাপক। জগদীশচন্দ্র যখন কেম্ব্রিজে পড়াশুনা করতেন তখন জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। তিনি জগদীশচন্দ্রের প্রতি ছিলেন স্নেহশীল। একদিন সমসাময়িক অপর দুই অধ্যাপক হোরেস ব্রাউন এবং হাউএস্‌কে সঙ্গে নিয়ে জগদীশচন্দ্রের ল্যাবরেটরি দেখতে এলেন। জগদীশচন্দ্রের পরীক্ষাগুলি দেখে জগদীশচন্দ্রের প্রতি তাঁর সম্ভ্রম বেড়ে গেল। ইতিপূর্বে রয়াল সোসাইটি জগদীশচন্দ্রের গবেষণা সংক্রান্ত পত্রটি নিজেদের ম্যাগাজিনে প্রকাশ করে নি জগদীশচন্দ্রের প্রতি বিদ্বিষ্ট হয়ে। অধ্যাপক ভাইন্‌স্ অনুরোধ করলেন জগদীশচন্দ্র যেন ওই গবেষণাপত্রটি লিলিয়ান সোসাইটিতে পাঠিয়ে দেন। সঙ্গে তিনি জগদীশচন্দ্রকে আমন্ত্রণ জানালেন লিলিয়ান সোসাইটিতে বক্তৃতা দেবার জন্য। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে মার্চ লিলিয়ান সোসাইটিতে জগদীশচন্দ্র বক্তৃতা দিলেন। রয়াল ইনস্টিটিউশনে বক্তৃতার চাইতেও লিলিয়ান সোসাইটিতে বক্তৃতা আরও যুক্তিপূর্ণ এবং প্রত্যয়মূলক হল।

লিলিয়ান সোসাইটিতে বক্তৃতার পর ডঃ ওয়ালার জগদীশচন্দ্রের

প্রত্যক্ষ বিরোধিতায় নামলেন। লিলিয়ান সোসাইটি যখন জগদীশচন্দ্রের গবেষণাপত্রটি ছাপাবার উদ্যোগ গ্রহণ করছে তখন ওয়ালারের এক হিতৈষী জানালেন যে ওই বক্তৃতার বিষয়বস্তু নাকি ওয়ালার আগেই কোন জার্নালে প্রকাশ করেছেন। লিলিয়ান সোসাইটির বক্তৃতার সময় ওয়ালার উপস্থিতই ছিলেন না। দেখা গেল ঘটনা সত্য। লিলিয়ান সোসাইটি ঘটনার সত্যতা যাচাই করবার জন্য জগদীশচন্দ্রের কাছে জানতে চাইলেন। সমস্ত ব্যাপারটা জগদীশচন্দ্রের কাছে প্রাঞ্জল হয়ে উঠল। ইতিপূর্বে রয়াল সোসাইটি যে জগদীশচন্দ্রের গবেষণাপত্র তাদের জার্নালে প্রকাশ করেন নি তার মূলে ছিলেন ওয়ালার। জার্নালে না ছাপলেই রয়াল ইনস্টিটিউশন প্রবন্ধটি রেখে দেয় তাঁদের "আর্কাইভে"। এই ঘটনার প্রায় আট মাস পর ফিজিওলজিকাল সোসাইটির পত্রিকায় ওয়ালার হুবহু একই বিষয়-সম্বলিত প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। ভাগ্যক্রমে লিলিয়ান সোসাইটির সম্পাদক হাওএসের কাছে রয়াল সোসাইটির আর্কাইভে রাখা জগদীশচন্দ্রের প্রবন্ধের কপি ছিল। এতে তৎকালীন বিদ্বাৎসমাজ ওয়ালারের জগদীশচন্দ্রকে অপদস্থ করবার হীন চক্রান্তের ব্যাপারটি বুঝতে পারলেন। লিলিয়ান সোসাইটি সমুচিত গুরুত্ব সহকারে জগদীশচন্দ্রের প্রবন্ধটি তাঁদের জার্নালে প্রকাশ করলেন। প্রথম পুস্তক প্রকাশ এবং ভগিনী নিবেদিতা। ইংলণ্ডের প্রখ্যাত পুস্তক প্রকাশক সংস্থা ওরিয়েন্ট লংম্যান জগদীশচন্দ্রের প্রথম গ্রন্থ "জীবন এবং জড় বস্তুতে সাড়া" প্রকাশ করলেন। সেটা ছিল ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাস। বইটি রচনায় এবং প্রকাশে জগদীশচন্দ্রকে অসাধারণ পরিশ্রম করতে হয়েছিল। এই কাজে যাঁর কাছ থেকে সব থেকে বেশী সাহায্য পেয়েছিলেন তিনি ছিলেন ভগিনী নিবেদিতা। বস্তুত জগদীশচন্দ্রের সমর্থনে মত আদায় করবার জন্য ভগিনী নিবেদিতা পাশ্চাত্য মহলে বাক্‌যুদ্ধে নেমেছিলেন। সরকার এবং বিদেশী বিজ্ঞানীদের সঙ্গে জগদীশচন্দ্রের সংগ্রামকে নিবেদিতা "বোস ওয়ার" নাম দেন।

জগদীশচন্দ্রের বেশীর ভাগ লেখাই নিবেদিতা সম্পাদনা করে দিতেন। ইংরেজি ভাষার উপর নিবেদিতার অসাধারণ দখল ছিল প্রশ্নাতীত।

স্বদেশে স্বতঃস্ফূর্ত উন্মাদনা

ওয়ালার প্রমুখ কয়েক জন কূটচক্রী বিজ্ঞানীর সক্রিয় বিরোধিতা সত্ত্বেও সাধারণ বিজ্ঞানীমহল জগদীশচন্দ্রের দেওয়া রয়াল সোসাইটিতে বক্তৃতার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন। এর পরবর্তী পর্যায়ে জগদীশচন্দ্র যখন অত্যন্ত সাফল্য এবং প্রত্যয়ের সঙ্গে লিলিয়ান সোসাইটিতে নিজের বক্তব্য উপস্থাপিত করলেন তখন বিজ্ঞান বিষয়ে জগদীশচন্দ্রের অসাধারণ প্রতিভার কথা সকলে একবাক্যে স্বীকার করে নিলেন। পাশ্চাত্যদেশের এই সাফল্যে বাংলা তথা ভারতবর্ষ গৌরবান্বিত বোধ করল। জগদীশচন্দ্রের এই সাফল্যের বার্তা দেশের আপামর জন-সাধারণের মধ্যে আরও ভালভাবে প্রচারের ভার নিলেন জগদীশচন্দ্রের পরম সুহৃদ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি এবং শান্তিনিকেতনের বিজ্ঞান শিক্ষক জগদানন্দ রায় প্রবন্ধ রচনা করে জগদীশচন্দ্রের প্রশস্তি গাইলেন। আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী জগদীশচন্দ্রের নব আবিষ্কারের উপর প্রবন্ধ লিখলেন।

উদ্ভিদজীবন এবং জগদীশচন্দ্র

বিজ্ঞানীদের মনে ধারণা ছিল যে পদার্থবিদ্যা বা রসায়নবিদ্যা দ্বারা উদ্ভিদের কার্যকলাপ ব্যাখ্যা করা যায় না। তা হলে উদ্ভিদদেহের মধ্যে নিশ্চয়ই কোন অদৃশ্য শক্তি রয়েছে যার দ্বারা তাদের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু জগদীশচন্দ্র পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করলেন কোনরকম কল্পিত শক্তির দ্বারা উদ্ভিদের কার্যকারণ ব্যাখ্যা করা যায় না। তিনি পরীক্ষা করে দেখালেন পদার্থবিদ্যার যে তত্ত্ব দ্বারা জড়ের উপর শক্তির কার্যকলাপ ব্যাখ্যা করা যায় সেই একই প্রকার তত্ত্বের দ্বারা উদ্ভিদের উপর শক্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ব্যাখ্যা করা যায়।

এই প্রসঙ্গে জগদীশচন্দ্র উদ্ভিদের ঘুমের ঘটনা ব্যাখ্যা করলেন। তখনকার দিনে উদ্ভিদতত্ত্ববিদ্‌রা মনে করতেন যে ঘুমের ব্যাপারটা

উদ্ভিদদেহের একটা বিশেষ কাজ। আলোর দ্বারা ঐ কাজ নিয়ন্ত্রিত হয়। জগদীশচন্দ্র বললেন, আলো যদি উদ্ভিদের ঘুমকে নিয়ন্ত্রিত করত তবে সূর্যের আলো মিলিয়ে যেতেই সব গাছের পাতা বুঁজে যেত। তিনি বললেন, রাত্রির অন্ধকারকে উদ্ভিদের ঘুমের কারণ হিসেবে প্রতিপন্ন করা যায় না। জগদীশচন্দ্র আরও প্রশ্ন রাখলেন যে আলোর উত্তেজনাই যদি উদ্ভিদের ঘুমের কারণ হত তবে মেঘলা দিনে কেন কোন কোন গাছের পাতা বুঁজে আসে? তখন তো আলোর উত্তেজনা থাকে না। তা হলে তখন কোন কোন গাছের পাতা বুঁজে আসে কেন?

আলোর উত্তেজনায় প্রতি ২৪ ঘণ্টায় গাছের পাতা কি করে ওঠানামা করে তা জগদীশচন্দ্র ব্যাখ্যা করলেন। লাউ বা কুমড়ো গাছের লতান ডগার উপরের পিঠে ক্রমাগত রোদ বৃষ্টি ইত্যাদি লাগায় উপরের পিঠ নিচের পিঠের তুলনায় কম সংবেদনশীল। অনেকক্ষণ যাবৎ লতার উপরের পিঠে সূর্যের আলো সোজাসুজি পড়তে থাকায় আলোর উত্তেজনা ডগার মধ্য নিয়ে নিচের পিঠে পৌঁছবে। কিন্তু কুমড়ো ডগার উপরের পিঠের থেকে নিচের পিঠ বেশী সংবেদনশীল। ফলে সূর্যের আলোতে উপরকার পিঠ যতটা উত্তেজিত হয় নিচের পিঠ তার থেকে বেশী উত্তেজিত হয়ে ওঠে। তখন নিচের পিঠ উপরের পিঠের তুলনায় বেশি সংকুচিত হয়ে পড়ে।

সন্ধ্যাবেলা আলোর তেজ কমে আসায় গাছের পাতা ঘুমিয়ে পড়ে না। সমস্ত দিন আলোর উত্তেজনা পাতার উপর পিঠ থেকে নিচের পিঠে এসে সন্ধ্যাবেলায় ওই পিঠের সংকোচনের মাত্রা বাড়িয়ে তোলে। তখন মনে হয় যেন পাতাগুলি ঘুমিয়ে পড়েছে। রাত্রিবেলায় আর আলোর উত্তেজনা থাকে না। পাতার বিকৃত অণুগুলি তখন পূর্বাবস্থা ফিরে পাওয়ার সুযোগ পায়। তখন পাতা আবার সোজা হয়ে দাঁড়ায়। এই জন্য রাত্রিবেলায় সূর্যের আলোর অনুপস্থিতিতে গাছের পাতা জাগে।

প্রচলিত ধরেণা ছিল এই যে সূর্যের আলো ফুটবার সঙ্গে সঙ্গে গাছ তার পাতাগুলোকে মেলে ধরে। জগদীশচন্দ্র পরীক্ষা করে

দেখলেন কোন কোন গাছের পাতা মাঝরাতে খোলে। কারণ সমস্ত দিন সূর্যালোকের যে উত্তেজনা গাছের পাতার উপর পড়ে তার সবটা পাতাগুলোকে নামাতে খরচ হয়ে যায় না। যে অংশটা সঞ্চিত থাকে তাই বিকৃত পাতাগুলিকে মেলে ধরে। জগদীশচন্দ্র বললেন সে শক্তি সঞ্চয় করবার ক্ষমতা সব গাছের সমান নয়। যে গাছ যত বেশি শক্তি সঞ্চয় করতে পারে সেই গাছ তত তাড়াতাড়ি জেগে ওঠে।

বিজয়ীর বেশে স্বদেশে

সালটা ছিল ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দ। ইংলণ্ডে কীর্তিমান বিজ্ঞানীমহলে স্বীয় বিজ্ঞান প্রতিভার জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত স্থাপন করে জগদীশচন্দ্র সস্ত্রীক দেশে ফিরে এলেন। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী তৎকালীন বৃটিশ সরকার এই বিজ্ঞান প্রতিভাকে স্বীকৃতি জানালেন **C.I.E. (Companion of the Indian Empire)** উপাধি দিয়ে।

১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের ২রা ফেব্রুয়ারী "ভারত সঙ্গীত সমাজ" জগদীশচন্দ্রকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন। সেই সভায় সভাপতিত্ব করেন কুচবিহারের তৎকালীন মহারাজা। সেই সভার জন্য বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সঙ্গীত রচনা করলেন—"জয় হোক, তব জয়।" হৃদয়ের আবেগ মথিত করে সরলাদেবীর লেখনী থেকে বেরিয়ে এল – "বন্দি তোমার ভারত জননী বিদ্যামুকুটধারিণি।"

এইভাবে দেশের জ্ঞানী এবং গুণীজনের কাছ থেকে জগদীশচন্দ্র পেলেন অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা এবং ভালবাসা। জগদীশচন্দ্র বিজ্ঞানী হলেও সঙ্গীত এবং সাহিত্যের প্রতি ছিল তাঁর সহজাত প্রীতি। কলকাতার লোয়ার সার্কুলার রোডে তাঁর ছিল নিজস্ব বাড়ী। সেই বাড়ীতে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ আসতেন সুহৃদ জগদীশচন্দ্রকে সঙ্গ দান করার জন্য। আসতেন আরও অনেক সমাজের মাথাওয়ালা ব্যক্তি। কবিগুরু রচিত গানে এবং তাঁর সাহচর্যে জগদীশচন্দ্রের সঙ্গীত সন্ধ্যা মুখর হয়ে উঠত।

জগদীশচন্দ্র এই সময় প্রায়ই সস্ত্রীক বেরিয়ে পড়তেন কলকাতার আবাস ছেড়ে। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে গেলেন বুদ্ধগয়া। সঙ্গী ছিলেন কবিগুরু

এবং তাঁর পুত্র রথীন্দ্রনাথ, ভগিনী নিবেদিতা, ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার, মথুরামোহন সিংহ এবং আরও অনেকে। বুদ্ধগয়ায় বৌদ্ধধর্মের বই থেকে প্রতিদিন নিবেদিতা বৌদ্ধধর্মের অনুশাসন সম্বন্ধীয় অংশ থেকে পাঠ করতেন, কখনও বা আর্ণল্ডের লেখা "লাইট অফ এশিয়া" থেকে আবৃত্তি করতেন। গুরুদেবও স্বরচিত কবিতা থেকে আবৃত্তি করতেন। সকলের সঙ্গে জগদীশচন্দ্রও আবৃত্তি ও সাংস্কৃতিক আলোচনায় বিভোর হয়ে যেতেন। দিনের বেলা মন্দির প্রাঙ্গণে এঁদের পদধূলি পড়ত, কোনদিন-বা এঁরা যেতেন পার্শ্বস্থ গ্রাম পরিদর্শন করতে। দিনান্তে সূর্য যখন পশ্চিম গগনে বিলীয়মান তখন জগদীশচন্দ্র এঁদের নিয়ে বোধিদ্রুমতলে নীরবে বসে থাকতেন ধ্যানস্থ সন্ন্যাসীর মতো। জগদীশচন্দ্রের দার্শনিক মন এইভাবে গুরুদেবের সাহচর্যে এবং ভগিনী নিবেদিতার সাংস্কৃতিক আলোচনায় গভীর তৃপ্তি পেত।

"ফেডারেশন হল" প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রস্তাবক এবং পৃষ্ঠপোষক ছিলেন জগদীশচন্দ্র। ফেডারেশন হল জাতীয় মিলন মন্দির রূপে চিহ্নিত হবে এই ছিল স্বদেশপ্রেমী জগদীশচন্দ্রের অন্তরের কামনা। ওই হলে স্বদেশের সংস্কৃতি ও শিল্প সম্বন্ধে দেশের গুণীসমাজ আলোচনা করবেন। এটি হবে জ্ঞানের পীঠস্থান এই ছিল অন্যান্যদের মতো জগদীশচন্দ্রের মনোবাসনা। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর আনন্দমোহন বসু ফেডারেশন হলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন। মানুষ জগদীশচন্দ্রের আর একটি স্বপ্ন সার্থক হল।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দেই শিক্ষা বিভাগ থেকে এক আদেশ জারি করে ছাত্রদের রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশ গ্রহণ নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করা হল। দেশের মানুষ এই আদেশের প্রতিবাদ করল। এই অন্যায় আদেশের তাৎপর্য বুঝতে জগদীশচন্দ্রের দেরী হল না। তিনি গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে প্রস্তাব করলেন এক জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার, যেখানে ছাত্ররা নিয়মিত বক্তৃতা দিতে পারবে বা সাংস্কৃতিক আলোচনায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে পারবে।

তৃতীয় বিজ্ঞান মিশন

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে জগদীশচন্দ্রের পদোন্নতি হল। ইতিমধ্যে বিদেশে তাঁর লেখা বিজ্ঞান বিষয়ে মৌল গবেষণা সংক্রান্ত গ্রন্থ যথেষ্ট সমাদৃত হয়েছে, নানা দেশ থেকে আমন্ত্রণও আসছে। জগদীশচন্দ্র স্থির করলেন তিনি আবার বিদেশে পাড়ি দেবেন। এবার আর শুধু ইউরোপ নয়, আমেরিকাও যাবেন। ভারত সরকার যাতে তাঁর ছুটি মঞ্জুর করেন তারজন্য গোপালকৃষ্ণ গোখলে তৎকালীন ছোটলাট স্যার অ্যাণ্ড্রু ফ্রেজারকে অনুরোধ করলেন। সরকারি আদেশ বার হতে দেরী হচ্ছে দেখে ১৯০৭ সালে জগদীশচন্দ্র ছুটি নিয়েই ইউরোপ যাত্রা করলেন এর এক বছর পর ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারত সরকার তাঁর ডেপুটেশন এবং ছুটি মঞ্জুর করলেন। জগদীশচন্দ্র যখনই বিদেশে গেছেন তখনই সুযোগ্য সহধর্মিণী অবলাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেছেন। এবারও তার ব্যতিক্রম হল না। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে জগদীশচন্দ্র সস্ত্রীক লণ্ডন এলেন। লণ্ডনে বসেও জগদীশচন্দ্র মাতৃভূমির কথা একদিনের জন্যও ভুলতে পারেন নি। এর কিছুদিন আগেই গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে জগদীশচন্দ্রের কথা হয়েছিল বোলপুরে ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠার। লণ্ডনে বসে জগদীশচন্দ্র তাঁরই একজন প্রিয় ছাত্র সুরেশচন্দ্র নাগের সঙ্গে পরামর্শ করলেন কি করে ওই আশ্রমের উন্নতি করা যায়। আশ্রমে কারিগরি বিভাগ স্থাপন করলে স্থানীয় তথা বাংলার ছেলেমেয়েরা হাতের কাজ শিখে আত্ম-নির্ভরশীল হতে পারবে—এই চিন্তা স্বদেশপ্রেমী জগদীশচন্দ্রের মাথায় এল। তিনি বন্ধু রবীন্দ্রনাথকে সেইমত পরামর্শ দিয়ে চিঠি লিখলেন।

এবারের যাত্রায় বেশি দিন লণ্ডনে থাকা হল না। ভগিনী নিবেদিতা তখন লণ্ডনে। কিছুদিনের মধ্যেই জগদীশচন্দ্র সস্ত্রীক আমেরিকা যাত্রা করলেন। ভগিনী নিবেদিতাও তাঁদের সহযাত্রিণী হলেন। নিবেদিতার অনুরোধে তাঁরা আমেরিকা যাবার আগে নিবেদিতার জন্মভূমি আয়ার্ল্যাণ্ডে বেড়াতে গেলেন। একমাস উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ডের বিভিন্ন

জায়গায় বেড়িয়ে তাঁরা যাত্রা করলেন আমেরিকার বোস্টন শহরের উদ্দেশ্যে।

আমেরিকায় জগদীশচন্দ্র ওলি বুলের বিধবা স্ত্রী সেরা বুলের কাছে থাকতেন। স্বামী বিবেকানন্দ সেরা বুলকে ধরামাতা বলে ডাকতেন। এই মহীয়সী মহিলা জগদীশচন্দ্র এবং অবলাকে সন্তানস্নেহে যত্ন-আত্তি করতেন। আমেরিকায় জগদীশচন্দ্র বক্তৃতা দিলেন ইলিনস, অ্যান আর্বব, উইস্কলসিন, শিকাগো প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে। এর পর বক্তৃতা দিলেন বোস্টন মেডিক্যাল সোসাইটিতে, বাল্টিমোরে অবস্থিত বটানিকাল সোসাইটি অফ্ আমেরিকাতে, শিকাগো অ্যাকাডেমি অফ্ সাইন্সে। সমস্ত সভাতেই জগদীশচন্দ্র দৃঢ় যুক্তি এবং পরীক্ষার দ্বারা উপস্থাপিত করেন "যান্ত্রিক ও বৈদ্যুতিক উত্তেজনায় উদ্ভিদদেহে সাড়া"। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে জগদীশচন্দ্র ভারতে ফিরে এলেন। সঙ্গে এলেন ভগিনী নিবেদিতাও।

স্বদেশের হিতার্থে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে যোগাযোগ

এই সময় জগদীশচন্দ্র সস্ত্রীক শ্রীঅরবিন্দকে নিয়ে বাগবাজারের বোসপাড়া লেনে ভগিনী নিবেদিতার বাড়ীতে তাঁর সঙ্গে মাঝে মাঝে সাক্ষাৎ করতে যেতেন। জগদীশচন্দ্রের লেখার কাজে নিবেদিতা সাহায্য করতেন। জগদীশচন্দ্রও নিবেদিতা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের ব্যাপারে তাঁকে নানারকম পরামর্শ দিয়ে উৎসাহিত করতেন। সস্ত্রীক জগদীশচন্দ্র, ভগিনী নিবেদিতা, জগদীশচন্দ্রের বোন লাবণ্যপ্রভা এবং স্বামী বিবেকানন্দের আর এক শিষ্যা সিষ্টার ক্রিষ্টিন একই পরিবারভুক্ত পরিজনদের মতো প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলাটা আলোচনা, পরামর্শ প্রভৃতির মধ্য দিয়ে কাটাতেন। এই মনীষী বৈজ্ঞানিক মাঝে মাঝে সমকালীন বৈজ্ঞানিক বা কর্মক্ষেত্রের উপরওয়ালার বিরূপ মনোভাবে ব্যথিত হতেন। মাঝে মধ্যে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়তেন। তখনই ছুটতেন ভগিনী নিবেদিতার কাছে। ভারতপ্রেমী স্বামীজির মন্ত্রশিষ্যা এই মহীয়সী মহিলা জগদীশচন্দ্রকে নানারকম সান্ত্বনা বাক্য দ্বারা উৎসাহিত করতেন।

বৈজ্ঞানিক হলেও জগদীশচন্দ্র ছিলেন ভারতীয় দর্শন এবং সংস্কৃতিতে গভীর অনুরাগী। এই পরিচয় আমরা তাঁর জীবনের প্রতি পদক্ষেপে দেখতে পাই। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের গ্রীষ্মের ছুটিতে জগদীশচন্দ্র নিবেদিতার সঙ্গে সস্ত্রীক বেরিয়ে পড়েন কেদার-বদরী দর্শনে। কেদার-বদরী দর্শন করে তাঁর ধর্মপিপাসু মন তৃপ্তি লাভ করে।

ময়মনসিংহ ছিল জগদীশচন্দ্রের জন্মস্থান। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনীর চতুর্থ অধিবেশনের জন্য স্থান নির্বাচিত হল ময়মনসিংহ। সেই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করবার জন্য আহূত হলেন বিজ্ঞানী আচার্য জগদীশচন্দ্র। ইতিমধ্যেই বাংলা সাহিত্যে জগদীশচন্দ্রের অনুরাগ এবং ব্যুৎপত্তির কথা গুণীসমাজে প্রচারিত হয়েছে। বাংলা ভাষায় জগদীশচন্দ্রের লেখা কিছু প্রবন্ধও প্রকাশিত হয়েছে। তা ছাড়া কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং কামনা ছিল আচার্য জগদীশচন্দ্রের সাহিত্যিক প্রতিভা বিকাশে। ময়মনসিংহের সেই ঐতিহাসিক সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতির ভাষণের মূল বিষয় ছিল "বিজ্ঞানে সাহিত্য"। ওই অধিবেশনে জগদীশচন্দ্র পর পর দুই দিন ভাষণ দেন, একদিন মাতৃভাষা বাংলায় আর একদিন ইংরেজিতে। জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার সম্বন্ধে তাঁর বাংলা বক্তৃতার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় পরীক্ষা সহযোগে শোত্রীমণ্ডলীকে দেখান হল। এইভাবে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চার দ্বার খুলে দিলেন বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী আচার্য জগদীশচন্দ্র।

১৯১১ খ্রীষ্টাব্দ। ইংলণ্ডের রাজা তখন পরাধীন ভারতেরও রাজা। পঞ্চম জর্জের রাজ্যাভিষেকের বছর। এই উপলক্ষে ভারত সরকার জগদীশচন্দ্রকে সি. এস. আই. উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেন। কিন্তু ওই বছরটি আচার্যদেবের জীবনে শোকের বছর হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। তখন ছিল দুর্গাপূজোর ছুটি। আচার্য জগদীশচন্দ্র স্ত্রী অবলাদেবীকে নিয়ে দার্জিলিং গেলেন বেড়াতে। সঙ্গে গেলেন ভগিনী নিবেদিতা। তাঁরা উঠলেন অবলাদেবীর ভগ্নীপতি ডি. এল. রায়ের

বাড়ীতে। সেই বাড়ীতেই নিবেদিতা দেহত্যাগ করেন ১৩ই অক্টোবর। এতে জগদীশচন্দ্র এবং স্ত্রী অবলাদেবী শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়লেন। ভগিনী নিবেদিতার প্রতি জগদীশচন্দ্রের ছিল প্রগাঢ় শ্রদ্ধা এবং প্রীতি। প্রকৃতপক্ষে জগদীশচন্দ্রের সংগ্রামের অন্যতম সঙ্গীই ছিলেন নিবেদিতা। বিশ্বের বিজ্ঞানীমহল যখন এই মনীষী বিজ্ঞানীর অবদানকে হেয় করবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিলেন তখন নিবেদিতাই জগদীশচন্দ্রকে বল এবং প্রেরণা জুগিয়েছিলেন। মুহূর্তের জন্যও জগদীশচন্দ্রের প্রতিভা সম্বন্ধে তাঁর বিশ্বাস শিথিল হয় নি। নিবেদিতার স্মৃতি-তর্পণ করতে গিয়ে এক জনসভায় জগদীশচন্দ্র এই কথা অকপটে স্বীকার করেছিলেন। ভগিনী নিবেদিতার স্মৃতিকে বাংলা তথা ভারতবাসীর অন্তরে চির জাগরুক রাখবার জন্য জগদীশচন্দ্র কিছু অর্থ রেখে গিয়েছিলেন। সেই অর্থে জগদীশচন্দ্রের স্ত্রী অবলাদেবী বিজ্ঞান মন্দিরে "নিবেদিতা হল" তৈরি করান।

দেশের মানুষের প্রতি জগদীপচন্দ্রের অন্তরের টান তাঁর বিভিন্ন কাজের মধ্যেই পরিস্ফুট। রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করার যথেষ্ট-সুযোগ ছিল। কারণ দেশবন্ধু ছিলেন তাঁর সম্বন্ধী, আনন্দমোহন বসু ভগ্নীপতি, শ্রীঅরবিন্দ ছিলেন তাঁর অন্যতম শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব, সর্বোপরি ভগিনী নিবেদিতা ছিলেন তাঁর অত্যন্ত কাছের মানুষ। এঁরাও বুঝেছিলেন জগদীশচন্দ্রকে রাজনীতির ঘুর্ণাবর্তে নিলে তাঁর বিজ্ঞানচর্চা ব্যাহত হবে, তা ছাড়া ইংরেজ সরকারের কোপানলে তিনি দগ্ধ হবেন। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় জগদীশচন্দ্রকে ডি. এস. সি. উপাধিতে ভূষিত করেন। এই সময় গবেষণার কাজে অর্থ সাহায্য করবার জন্য জগদীশচন্দ্র ভারত সরকারের কাছে আবেদন করেন। তাঁর আবেদনে সাড়া দিয়ে ভারত সরকার বার্ষিক আঠার হাজার টাকা মঞ্জুর করেন যাতে জগদীশচন্দ্র পাহাড়ী এলাকায় ঠাণ্ডা পরিবেশে উদ্ভিদ জীবন নিয়ে পরীক্ষা করবার জন্য গবেষণাগার স্থাপন করতে পারেন।

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দেই জগদীশচন্দ্র কলকাতার রামমোহন লাইব্রেরির সভাপতি হন এবং আজীবন ওই পদে বৃত থাকেন।

১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে নোবেল কমিটি রবীন্দ্রনাথকে 'নোবেল' পুরস্কার দিয়ে তাঁর সাহিত্য প্রতিভাকে বিশ্বের সাহিত্যিকদের দরবারে সসম্মানে স্বীকৃতি দেন। এই ঘটনায় জগদীশচন্দ্র অভিভূত হয়ে পড়েন। গুরুদেবকে তিনি লিখলেন—"পৃথিবীতে তোমাকে এত দিন জয়মাল্য ভূষিত না দেখিয়া বেদনা অনুভব করিয়াছি। আজ সেই দুঃখ দূর হইল। দেবতার এই করুণার জন্য কি করিয়া আমার কৃতজ্ঞতা জানাইব? চিরকাল শক্তিশালী হও, চিরকাল জয়যুক্ত হও। ধর্ম তোমার চির সহায় হউক।" নোবেল প্রাপ্তিতে বাংলার সাহিত্য সমাজ বোলপুরের শান্তিনিকেতনে আম্রকুঞ্জে গুরুদেবের জন্য এক অভ্যর্থনা সভার আয়োজন করেন। ওই সভায় সভাপতিত্ব করেন স্বয়ং জগদীশচন্দ্র।

আবার ইউরোপ যাত্রা

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দ, এপ্রিল মাস। জগদীশচন্দ্র তাঁর নিজের উদ্ভাবিত যন্ত্রপাতি এবং কিছু ভীরু ও লাজুক গাছপালা নিয়ে চতুর্থবারের জন্য ইউরোপ ভ্রমণে বার হলেন। সঙ্গে নিলেন গ্যালভানোমিটার, রেসো-নেন্ট রেকর্ডার, ডেথ রেকর্ডার ইত্যাদি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম-যন্ত্র. যন্ত্রপাতি ঠিকঠাকমতই লণ্ডনে পৌঁছল। জগদীশচন্দ্র তাঁর জন্য নির্দিষ্ট গাড়ী থেকে নিজের হাতে কিছু কিছু যন্ত্রপাতি অপেক্ষমান ট্যাক্সিতে তুলে ছিলেন। দুটো যন্ত্র দিলেন কুলীর কাছে। ট্যাক্সিতে করে যন্ত্রগুলো যখন বাসস্থানে পৌঁছল তখন দেখা গেল কুলীর কাছে দেওয়া যন্ত্রদুইটি বিকল হয়ে গিয়েছে। এদিকে জগদীশচন্দ্রের এক সহকারী দেশ থেকে দুইটি লজ্জাবতী-লতা এবং দুইটি বন চাড়াল গাছ ভারত থেকে জাহাজে করে ইউরোপের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলেন।

জাহাজের মধ্যে পথের ধারে গাছগুলি রাখা হয়েছিল। মজা করবার জন্য কতগুলি ছোট ছেলে প্রত্যেকদিন এসে গাছগুলোকে ছুঁয়ে দিত। তাতে গাছগুলোর মৃতপ্রায় অবস্থা। জাহাজের ক্যাপ্টেনকে একথা বলতে তিনি ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝতে পারলেন। তিনি তার দিয়ে তৈরি খাঁচার মধ্যে গাছগুলোকে পুরে দিলেন তখন আর ছোট

ছেলে গুলি গাছগুলোর নাগাল পেতনা। জাহাজ যতদিন ভারত-মহাসাগর দিয়ে চলল গাছগুলি সুস্থই থাকল। তার নতুন কচিপাতাও বার হল। কিন্তু জাহাজ যখন ভূমধ্য সাগরে পড়ল তখন ভারতীয় আবহাওয়া বদলে গেল, ফলে পাতাগুলি নুইয়ে পড়তে লাগল। জাহাজ যখন লিয়ন সাগরে পড়ল তখন প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় গাছগুলি মৃতপ্রায় হওয়ার উপক্রম হল। গাছের খাঁচার ভিতরের পরিবেশকে স্বাভাবিক উষ্ণতায় রাখবার জন্য খাঁচার উপর কম্বল জড়ান হল। রোদ উঠলে গাছগুলিকে মাঝে মাঝে রোদে দেওয়া হতে লাগল। এইভাবে এপ্রিল মাসের শেষদিকে গাছগুলিকে নিয়ে জগদীশচন্দ্রের ছাত্র লণ্ডনে পৌঁছালেন। কুলীদের উপর ভরসা করতে না পেরে জগদীশচন্দ্রের ছাত্র নিজের হাতে গাছগুলিকে ট্যাক্সিতে তুললেন এবং ট্যাক্সিতে উঠে কাঁচের পাল্লা বন্ধ করে দিলেন যাতে গাছগুলির উপর পরিবেশের কোন রকম খারাপ প্রভাব না পড়ে। অবশেষে গাছগুলি লণ্ডনের বাড়ীতে পৌঁছাল। সেগুলি রাখা হল জগদীশচন্দ্রের বাসস্থানের বসবার ঘরে। যদিও তখন এপ্রিলের শেষ, কিন্তু তখনও লণ্ডনে ভয়ানক ঠাণ্ডা। যে গাছগুলি ভারতীয় আবহাওয়ায় আজন্ম লালিত তা লণ্ডনের ওই শীত সহ্য করতে পারবে কেন ? তাছাড়া ঘরে ছিল গ্যাসের আলো। গাছের উপর গ্যাসের প্রতিক্রিয়া হল। একদিন সকালে উঠে দেখা গেল গাছগুলি অর্ধমৃত। তখন লণ্ডনের রিজেণ্ট পার্কে ছিল রয়াল বোটানিক গার্ডেন। সেখানে "হট হাউসে" প্রাচ্য দেশের আবহাওয়া সৃষ্টি করে কলা গাছ, ধান গাছ ইত্যাদি জন্মান হত। গাছগুলিকে সেই "হট হাউসে" যাতে রাখা যায় তার জন্য জগদীশচন্দ্র সেখানকার ডিরেক্টরকে অনুরোধ করলেন। এতে কাজ হল। সেখানকার হট হাউসে হিটার জেলে ভারতীয় পরিমণ্ডল সৃষ্টি করে গাছগুলোকে রেখে দেওয়া হল। গাছগুলো স্বাভাবিক হল। রয়াল বোটানিক গার্ডেনের সুপারিনটেণ্ড মিঃ কেল্প নিজে প্রত্যেকদিন গাছগুলোর পরিচর্যা করতেন। এই ঘটনা তখনকার "লণ্ডন টাইমসে" খবর হিসেবে বার হয়েছিল। গাছের

ব্যবস্থা হওয়ার পর সমস্যা দেখা দিল উপযুক্ত পরীক্ষাগার পাওয়ার। জগদীশচন্দ্র নিজে বার হলেন একটি উপযুক্ত বাড়ীর সন্ধানে। সাউথ কেনসিংটনে ময়দাভেলে একটি বাড়ী পাওয়া গেল। ঘরে আলো হাওয়া যথেষ্ট এবং বাড়ীর সংলগ্ন একটি বাগানও আছে। বাড়ীর যে ঘরটি সব থেকে বেশি উষ্ণ সেই ঘরটাই করা হল পরীক্ষাগার। সেই ঘরে টেবিলের উপর সাজিয়ে রাখা হল গ্যালভানোমিটার বৈদ্যুতিক সাড়া মাপবার জন্য, রেসোনেন্ট রেকর্ডার গাছের অনুভূতি নিজের থেকে রেখাঙ্কিত হওয়ার জন্য, এবং ডেথ রেকর্ডার গাছের মৃত্যুর মুহূর্ত জানবার জন্য।

ময়দাভেল পরীক্ষাগার দর্শনীয় স্থান হয়ে উঠল, ইংলণ্ডের জ্ঞানী গুণী ব্যক্তিগণ ঐ পরীক্ষাগার দেখবার জন্য প্রত্যেক দিন ভীড় করতে লাগলেন।

যে রয়াল ইনষ্টিটিউশনে জগদীশচন্দ্র ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে ইতিপূর্বে বক্তৃতা দিয়ে গেছেন সেই রয়াল ইনষ্টিটিউশন থেকেই এবার প্রথম বক্তৃতা দেবার আমন্ত্রণ এল। জগদীশচন্দ্র জানতেন যে ইউরোপ বাসীরা ভারতীয়দের ফিলজফার হিসেবে দেখতেই অভ্যস্থ, বৈজ্ঞানিক হিসেবে নয়। প্রকৃতপক্ষে তখনকার দিনে ইউরোপবাসীর মনে বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে ভারত তথা প্রাচ্যদেশের অধিবাসীরা বিজ্ঞান বিষয়ে পিছিয়ে। এই ধারণা দূর করবার জন্য ইউরোপীয় শিক্ষার পীঠস্থান অক্সফোর্ডেই প্রথম পরীক্ষা দেখাবেন বলে জগদীশচন্দ্র স্থির করলেন। অক্সফোর্ডে যাঁরা তাঁর মতের বিরোধী তাঁদের মধ্যমণি স্যার জন বার্ডেন স্যাণ্ডারসনকে প্রথম পরীক্ষা দেখাবেন বলে জগদীশচন্দ্র স্থির করলেন। ওই বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্রকে বিরোধিতা করলেও ছিলেন যুক্তিবাদী। তিনি জগদীশচন্দ্রকে অক্সফোর্ডের বোটানিকাল ল্যাবরেটরীতে পরীক্ষা দেখাবার আমন্ত্রণ জানালেন।

অক্সফোর্ডে বক্তৃতা

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দ, ২০শে মে ওইদিন জগদীশচন্দ্র পৃথিবীতে শিক্ষার পীঠস্থান অক্সফোর্ডে বক্তৃতা করবেন। রিজেন্ট পার্কের হট হাউস থেকে

গাছগুলিকে ট্রেনে করে নিয়ে আসা হল, সময় লাগল দুঘণ্টা। শীতের প্রকোপ কমেতনিই বরং তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। এত শীতে গাছগুলি যদি সাড়া না দেয় এই চিন্তা জগদীশচন্দ্রকে বিড়ম্বিত করতে লাগল।

বোটানিকাল ল্যাবরেটারীতে পৌঁছেই গাছগুলিকে রাখা হল একটা উষ্ণ ঘরে যাতে সেগুলি প্রবল শীত থেকে রক্ষা পেয়ে বেঁচে থাকে।

বক্তৃতার দিন জগদীশচন্দ্র যখন সভাগৃহে এসে উপস্থিত হলেন তখন সভাগৃহ কানায় কানায় পরিপূর্ণ। উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীদের মধ্যে বেশীর ভাগই শারীরতত্ত্ববিদ। তাঁরা প্রায় সকলেই স্ব স্ব গবেষণাগারে নতুন কিছু আবিষ্কারে ব্যাপৃত আছেন।

বক্তৃতার ভূমিকায় জগদীশচন্দ্র বললেন যে জীবন দর্শনের শ্রেষ্ঠ নিয়ম বহু এবং বিপরীতমুখী। উদ্ভিদ জগতে উদ্ভিদের নিজের দেওয়া প্রমাণের থেকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ আর কিছু হতে পারে না। সেই প্রমাণ পাওয়া সম্ভব "রেসনেন্ট-রেকর্ডার" নামক যন্ত্রের সাহায্যে।

স্তম্ভিত দর্শকমণ্ডলীর সামনে রেসনেন্ট রেকর্ডার যন্ত্রের সাহায্যে উদ্ভিদের হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া দেখালেন। এক সেকেণ্ডের এক হাজার ভাগ সময়ে বৃক্ষের হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া ওই যন্ত্রে পরিমাপ হতে লাগল। "অসিলেটিং রেকর্ডার" নামে আর একটি যন্ত্রে বনচাঁড়াল গাছের হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া রেখাঙ্কিত হতে লাগল।

এরপর জগদীশচন্দ্র গাছের উপর বিষ এবং উদ্দীপক ঔষধ প্রয়োগ করে প্রমান করে দিলেন যে মানুষের মত গাছেরও বিষ প্রয়োগে মৃত্যু ঘটে এবং প্রতিশেধক ঔষধে তা বেঁচেও ওঠে। এই ঐতিহাসিক ঘটনার পর জগদীশচন্দ্রের যাঁরা বিরুদ্ধবাদী ছিলেন তাঁরাও তাঁর মত স্বীকার করে নিলেন।

রয়াল ইনস্টিটিউশনে বক্তৃতা

পৃথিবীর যুগান্তকারী অসংখ্য আবিষ্কারের সাক্ষী এই রয়াল ইনস্টিটিউশন। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে এই ইনস্টিটিউশন প্রতিষ্ঠিত হয়।

টমাস ইয়ং, হামফ্রে ডেভি, মাইকেল ফ্যারাডে, জন টিনডল, লর্ড র‍্যালে, জে; জে টমসন প্রভৃতি প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিকগণের কর্মক্ষেত্র ছিল এই রয়াল ইনস্টিটিউশন। এখানেই তাঁরা তাঁদের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার দ্বারা যুগান্তর আনেন। এই প্রতিষ্ঠানে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকগণ নিয়মিত বক্তৃতা দিতেন, তাছাড়া প্রতি শুক্রবার রাত ৯টা থেকে ১০টা পর্যন্ত কোন বৈজ্ঞানিক তাঁর আবিষ্কার নিয়ে বক্তৃতা দিতেন। বক্তৃতা চলার সময় ওই প্রতিষ্ঠানের সামনে এত গাড়ী দাঁড়াত যে অন্য গাড়ী ওই প্রতিষ্ঠানের সামনে দিয়ে যেতে পারত না। ফলে শুক্রবারের বক্তৃতার সময় ১ ঘণ্টার বেশি চলতে দেওয়া হতনা, কিন্তু এই ব্যবস্থার ব্যতিক্রম ঘটল জগদীশচন্দ্র যেদিন বক্তৃতা দিলেন সেই দিন। এই ব্যবস্থার কথা জগদীশচন্দ্র আগে থেকে জানা ছিল। তাই রাত্রি ৯টায় শুরু করে ঠিক ১০টায় তিনি তাঁর বক্তব্য শেষ করলেন। কিন্তু উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলী জগদীশচন্দ্রের বক্তব্যে এত মুগ্ধ হয়েছিলেন যে তাঁরা জগদীশচন্দ্রকে বক্তৃতা চালিয়ে যেতে বার বার অনুরোধ করতে লাগলেন। এতে জগদীশচন্দ্র আরও কিছুক্ষণ তাঁর ভাষণ চালিয়ে গেলেন এবং মুগ্ধ দর্শকমণ্ডলীর সামনে আরও কিছু পরীক্ষা দেখালেন। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৯ শে জুন জগদীশচন্দ্র রয়াল ইনস্টিটিউশনে প্রথম বক্তৃতা দেন। তখনও তাঁর বক্তব্যের সঙ্গে পরীক্ষা এত সাদৃশ্যযুক্ত ছিল যে লর্ড র‍্যালের মত প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিকও জগদীশচন্দ্রের গবেষণার ভূয়সী প্রশংসা করেন। তখনই জগদীশচন্দ্রকে প্রাচ্যের জাদুকর আখ্যায় ভূষিত করা হয়।

ওই ঘটনার সতের বছর পর আজ যখন জগদীশচন্দ্র শ্রোতৃমণ্ডলীর সামনে নিজের বক্তব্য দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে উপস্থাপিত করতে যাচ্ছেন তখন ইংলণ্ডের কিছু অভিজ্ঞ ব্যক্তি তাঁকে সাহায্য করবার সংকল্প প্রকাশ করলেন। কিন্তু জগদীশচন্দ্র সবিনয়ে তাঁদের এই সাহায্য প্রত্যাখান করলেন, কারণ তিনি বুঝেছিলেন ওই ব্যক্তিদের সাহায্য গ্রহণ করলে তাঁর কৃতিত্ব খর্ব হবে, পাশ্চাত্যের সমালোচক বিজ্ঞানীরা এই ঘটনার বিকৃত ব্যাখ্যা করে জগদীশচন্দ্রকে জনসমক্ষে হেয় করবার চেষ্টা করবে।

কেম্ব্রিজে নিজের বিশ্ববিদ্যালয়ে :

জগদীশচন্দ্র ছিলেন কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম ভারতীয় ছাত্র। ওই প্রখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্ররা জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কারের কাহিনী গভীর আগ্রহের সঙ্গে পড়তেন এবং অনুধাবন করতেন। জগদীশচন্দ্র কেম্ব্রিজে তাঁর আবিষ্কৃত তথ্যগুলি পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করতে রাজী হয়েছেন জেনে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিদ্যার বিভাগের কর্মকর্তাগণ ভারতবর্ষ থেকে প্রয়োজনীয় গাছপালা আনিয়ে রাখলেন আগের থেকে।

কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতার দিন নির্দিষ্ট হল ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের ২রা জুন। প্রায় তিরিশ বছর আগে জগদীশচন্দ্র এখানকারই ছাত্র ছিলেন। সেই সময় উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের পরীক্ষাগারে যিনি সহকারী হিসেবে কাজ করতেন তিনি তখনও ওখানে কর্মরত। প্রাক্তন ছাত্র জগদীশচন্দ্রকে দেখে তিনি চিনতে পারলেন। জগদীশচন্দ্রকে ওই ব্যক্তি সশ্রদ্ধ অভিবাদন জ্ঞাপন করলেন। জগদীশচন্দ্রও তাঁর সঙ্গে করমর্দন করলেন। জগদীশচন্দ্র যখন কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দেখাবার জন্য আমন্ত্রিত হলেন তখন উদ্ভিদবিদ্যা পরীক্ষাগারের সর্বময় কর্তা ছিলেন অধ্যাপক ভাইন আর ডেমনস্ট্রেটর ছিলেন মিঃ ওক্। বক্তৃতার জন্য যেদিনটা স্থির হল, অর্থাৎ ২রা জুন সেইদিনটাতে শীতের প্রকোপ ছিল অত্যাধিক। সারাদিন ঝির ঝির করে বৃষ্টি পড়ছে। আকাশও মেঘাচ্ছন্ন চারদিক অন্ধকার। এই আবহাওয়ায় পরীক্ষার জন্য নির্দিষ্ট গাছগুলি কুঁকড়ে গেল। বক্তৃতা শুরু করার আগে জগদীশচন্দ্র ওই গাছগুলির উপর উদ্দীপক কিছু ওষুধ প্রয়োগ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে গাছগুলি সতেজ হয়ে উঠল।

সভাগৃহ কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ এবং তখনকার নামী বৈজ্ঞানিকগণের দ্বারা পরিপূর্ণ। তখন কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ট্রিপস পরীক্ষা। ওই পরীক্ষার পরীক্ষার্থীরা বিশেষ অনুরোধ করে পাঠাল যে জগদীশচন্দ্র যেন বক্তৃতা শেষ হয়ে যাওয়ার পর অনুগ্রহ করে তাঁদের জন্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেন।

প্রখ্যাত বিজ্ঞানী স্যার ফ্রান্সিস ডারউইন, অধ্যাপক সিউয়ার্ড, অধ্যাপক ব্ল্যাকম্যান এবং আরও অনেক বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী ওদিন সভাগৃহ আলো করে জগদীশচন্দ্রের বক্তব্য গভীর মনোযোগ এবং সম্ভ্রমের সঙ্গে অনুধাবন করতে লাগলেন।

বক্তৃতার শুরুতে জগদীশচন্দ্র তার নিজেরই উদ্ভাবিত যন্ত্রগুলির কার্যকলাপ শ্রোতৃমণ্ডলীকে বুঝিয়ে দিলেন। তারপর ওখানকার সহকারীকে আর্ক ল্যাম্প জ্বেলে বোর্ডের উপর অপ্টিকাল ল্যাণ্টার্ণের প্রথম স্লাইডের ছায়া ফেলতে বললেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আর্ক ল্যাম্প জ্বলল না, কারণ ওই ল্যাম্পের কিছু যন্ত্রাংশ বিকল হয়ে গেছে। জগদীশচন্দ্র এই ঘটনায় বিরক্ত হলেন, তিনি বললেন ষাট বছর আগে যে আর্কল্যাম্প আবিষ্কৃত হয়েছে তা যেকোন লোক জ্বালাতে পারে। আর আজ কিনা শিক্ষার অন্যতম পীঠস্থানে আর্কল্যাম্প অকেজো হয়ে গেল আর তা ঠিক করাও গেল না।

ইতিমধ্যে উদ্দীপক ওষুধ প্রয়োগের ফলে নুইয়ে পড়া গাছপালা সতেজ হয়ে উঠেছে। জগদীশচন্দ্রও উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। তিনি একের পর এক পরীক্ষা দ্বারা তাঁর আবিষ্কৃত তথ্য মুগ্ধ শ্রোতৃমণ্ডলীর সামনে উত্থাপিত করলেন। শ্রোতৃমণ্ডলী জগদীশচন্দ্রের উদ্ভাবনায় বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেল। এই ঘটনা সম্বন্ধে পরে ডারউইন বলতে গিয়ে বলেছিলেন যে জগদীশচন্দ্র কেবল দর্শকমণ্ডলীকে অভিভূতই করেন নি তিনি দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে যা যা প্রমাণ করলেন তা অত্যন্ত বিশ্বাসযোগ্য বলে প্রতীয়মান হয়েছে এবং ওই সব আবিষ্কার উদ্ভিদ তথা বিজ্ঞানের যেকোন শাখায় যুগান্তর আনবে।

ভিয়েনায় জগদীশচন্দ্র

উদ্ভিদবিদ্যা এবং শারীরবিদ্যার পীঠস্থান বলে ভিয়েনার খ্যাতি ছিল। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদ্‌বিদ্যা বিভাগের প্রধান ছিলেন অধ্যাপক মোলিশ। তিনি ছিলেন উদ্ভিদবিদ্যায় একজন অন্যতম বিশেষজ্ঞ। তিনি ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে জগদীশচন্দ্রকে

আমন্ত্রণ জানালেন বক্তৃতা দেবার জন্য। চিঠিতে তিনি জানালেন যে জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কৃত তথ্যের পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ দেখবার জন্য ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীগণ অত্যন্ত আগ্রহী। এই আমন্ত্রণ পত্র পেয়ে জগদীশচন্দ্র ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে জুন ভিয়েনা যাত্রা করলেন। পথ দীর্ঘ। সঙ্গে মহামূল্য গাছপালা এবং সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি। জগদীশচন্দ্র এই সব জিনিস নিয়ে সংরক্ষিত কামরায় উঠলেন। ওইসব সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি এবং খাঁচায় পোরা গাছপালা দেখে সহযাত্রীদের কৌতুহলের-সীমা ছিল না। যে ষ্টেশনে ট্রেন বেশীক্ষণ থামে সেখানেই জানলার বাইরে উৎসুক যাত্রীরা ভীড় করে। তাদের মধ্যে সামরিক বাহিনীর লোকজন ও ছিল। ট্রেনের করিডরে দেখা হল অষ্ট্রিয়াবাসী এক ভদ্রলোকের সঙ্গে। ভদ্রলোক ইংরেজিও বোঝেন, বলতেও পারেন। ভারতবর্ষে কোনদিন না এলে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ভদ্রলোকের অনেক কিছু জানা ছিল। এই ভদ্রলোকের সঙ্গে গল্পগুজব করে ট্রেনের সময়টা মন্দ কাটল না। জগদীশচন্দ্র বৃটিশ সরকারের তরফ থেকে ভিয়েনায় বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করতে যাচ্ছেন এই কথা শুনে ভদ্রলোক কার্যক্ষেত্রে বিজ্ঞানকে প্রয়োগের ব্যাপারে বৃটিশ জাতির অপারঙ্গমতার কথা বললেন। তার মানে তখনকার দিনে ইউরোপের সব শিল্প ব্যাণিজ্য জার্মান ও অষ্ট্রিয়ান জাতি একচেটিয়া করে নিয়েছে। কর্মক্ষেত্রেও ইংরেজ অফিসারগণ বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারে অজ্ঞ। কথাপ্রসঙ্গে ভদ্রলোক জগদীশচন্দ্রকে জানালেন যে তার দুই ছেলে সামরিক বিভাগে কর্মরত। মর্যাদায় এক ছেলে ক্যাপ্টেন এবং আর এক ছেলে লেফ্‌টেনাণ্ট। যুদ্ধের প্রয়োজনে বৈজ্ঞানিক তথ্য প্রয়োগে তারা দক্ষ হয়ে উঠেছে।

২৬শে জুন ভোরবেলা জগদীশচন্দ্র এবং তাঁর সহকর্মিগণ ভিয়েনা গিয়ে পৌঁছলেন। অধ্যাপক মোলিশ স্বয়ং রেল ষ্টেশনে এসে তাঁদেরকে অভ্যর্থনা করলেন। তাঁদের থাকবার ব্যবস্থাও অধ্যাপক মোলিশের বাড়ীতেই হল।

ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশাল প্রাসাদ বহিরাগত যেকোন মানুষকে আকৃষ্ট করত। এই প্রাসাদের সৌন্দর্য ও ছিল মনে দাগ কাটবার মত। ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন সাত আট হাজার ছাত্রছাত্রী পড়াশুনা করত। ছাত্রদের মত ছাত্রীরাও সমান অধিকার ভোগ করত। অথচ তখনকার দিনে কেম্ব্রিজ বা অক্সফোর্ড কোন বিশ্ববিদ্যালয়েই মেয়েদের প্রবেশাধিকার ছিল না।

বিকেলে উদ্ভিদ্‌বিদ্যার পরীক্ষাগারে অধ্যাপক বিজ্ঞানীগণ জগদীশচন্দ্রকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করলেন। উদ্ভিদ্ বিদ্যার পরীক্ষাগার ছিল প্রচুর যন্ত্রপাতি দ্বারা সুসজ্জিত। ওই পরীক্ষাগারের আবহাওয়া নিয়ন্ত্রিত করবার স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা ছিল। সেই পরীক্ষাগারে রক্ষিত গাছপালাগুলি উপযুক্ত পরিবেশে সজীব থাকত। অধ্যাপক মোলিশ তাঁর নিজস্ব মৌলিক গবেষণার ফল দেখালেন। আলুগাছের সঙ্গে টমাটো গাছের কলম কিভাবে করেছেন তা অধ্যাপক মোলিশ জগদীশচন্দ্রকে বুঝিয়ে দিলেন এবং দেখালেন যে একই গাছের মাটির নিচে ফলেছে আলু আর গাছের ডালে টমাটো। জগদীশচন্দ্রও তাঁর ছাত্র সহকর্মীকে নিয়ে নিজের উদ্ভাবিত সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি সমবেত বিজ্ঞানীগণকে বুঝিয়ে বললেন। বিজ্ঞানীগণ সম্ভ্রমপূর্ণ কৌতূহল নিয়ে জগদীশচন্দ্রের যন্ত্রপাতির ক্রিয়া প্রত্যক্ষ করলেন। ওই যন্ত্রগুলির বর্ধিতকরণ ক্ষমতা এক কোটি গুণ জেনে বিজ্ঞানীগণ বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন।

অধ্যাপক মোলিশ দ্বিধাহীন কণ্ঠে মেনে নিলেন যে আচার্য জগদীশচন্দ্র উদ্ভাবিত যন্ত্রগুলির তুলনায় তাঁদের যন্ত্রগুলি অনেক স্থূল। উদ্ভিদের অনুভূতির ব্যাপারটা তাঁদের কাছে এতদিন একেবারেই অজ্ঞাত ছিল। একজন ভারতীয় বিজ্ঞানী যে উদ্ভিদ্ বিদ্যায় এতটা এগিয়ে গেছেন তা ছিল তাঁদের ধারনার অতীত। উদ্ভিদ্ বিষয়ে জ্ঞান লাভের জন্য তাঁরা ভারতবর্ষে যাবেন বলেও সংকল্প ঘোষণা করলেন।

ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ওই সভায় সমবেত বিজ্ঞানীদের মধ্যে একজন ছিলেন রিসার্চ স্কলার। তিনি তাঁর কিছু মৌলিক গবেষণার

জন্য ফেলোশিপ পেয়েছেন। ওই ব্যক্তি জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিটি´ ভেরত্তন, ফেফার প্রভৃতি প্রখ্যাত অধ্যাপকগণের পরিচালনায় পাঁচ বছর গবেষণা করেছেন। উদ্ভিদ্‌বিদ্যার তিনটি জটিল রহস্যের সমাধান নিয়ে তিনি ব্যস্ত ছিলেন, তার মধ্যে একটি সমস্যার সমাধান করতে তিনি তিন বৎসর যাবৎ চেষ্টা করেও সমাধান করতে পারেননি। জগদীশচন্দ্রের সহকর্মী ছাত্র ডাঃ সেন রিসার্চ স্কলারের কাছ থেকে সমস্যাটি প্রসঙ্গে সবকিছু জেনে নিলেন। এর কিছুদিন আগেই জগদীশচন্দ্রের "ইরিটেবিলিটি"' নামে একটি গ্রন্থ বার হয়েছে। সেই গ্রন্থে ওই রিসার্চস্কলার কর্তৃক উত্তাপিত সমস্যা সমাধেনর সচিত্র বর্ণনা ছিল। সেই গবেষক ছাত্রটি তাঁর সমস্যা সমাধানের সচিত্র বিবরণ দেখে উত্তেজিত হয়ে উঠল। তখনও ওই গবেষকটির আরও দুইটি কঠিন সমস্যা ছিল যা সে দিনের পর দিন চেষ্টা করেও সমাধান করতে পারেনি। জগদীশচন্দ্র সেই গবেষকের কাছ থেকে তাঁর দ্বিতীয় সমস্যাটি জেনে নিলেন। জগদীশচন্দ্রের ছাত্র ডাঃ সেন "ইরিটেবিলিটি' গ্রন্থের শেষ দিকে একটি পাতা খুলে ওই গবেষকটির সামনে মেলে ধরলেন। সেই পাতাতে দেখা গেল গবেষকটির দ্বিতীয় সমস্যাটিও সমাধান করে দেওয়া আছে। এরপর গবেষকটি তার তৃতীয় সমস্যাটির কথা বলতে ডাঃ সেন তাকে আচার্য জগদীশচন্দ্রের ওই গ্রন্থের কুড়ি থেকে তেইশ প্রচ্ছদ পড়তে পরামর্শ দিলেন। গবেষকটি বইয়ের পাতা উল্টিয়ে নির্দেশিত অধ্যায়ে তার সমস্যা সমাধানের সচিত্র তথ্য পেয়ে গেল। জগদীশচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধায় তার মাথা লুটিয়ে এল। সে জগদীশচন্দ্রের কাছে সকাতরে প্রকাশ করল ভারতবর্ষে গিয়ে সে জগদীশচন্দ্রের তত্ত্বাবধানে তাঁর পরীক্ষাগারে গবেষণা করবে। অধ্যাপক মোলিশও জগদীশচন্দ্রকে বার বার অনুরোধ করলেন তিনি যেন কলকাতায় তার পরীক্ষাগারে অধ্যাপক মোলিশের আরও কিছু ছাত্রকে গবেষণা করার অনুমতি দেন। কিন্তু এর উত্তরে জগদীশচন্দ্র কি বলবেন। বলার মত পরীক্ষাগার তার কোথায়? কলকাতায় যে খুপরিতে তিনি গবেষণা চালিয়ে গেছেন তা কি বিদেশীদের কাছে দেখানর মত? কলকাতায়

ওই ঘরেতেও যখন নিজের গবেষণা করতে গেছেন কলেজের বৃটিশ কর্তৃপক্ষ তাতে পদে পদে বাধা দিয়েছেন। তিনি যাতে গবেষণার কাজ চালিয়ে যেতে না পারেন তার জন্য সপ্তাহে তাকে ছাব্বিশ ঘণ্টা ক্লাস করতে দেওয়া হত। এই পরিবেশে এবং পরিস্থিতিতেও যে জগদীশচন্দ্র গবেষণা করতে পেরেছেন তার মূলে ছিল তার অসাধারণ মনোবল এবং অভূতপূর্ব নিষ্ঠা। সর্বোপরি ছিল তাঁর প্রতিভা।

পরদিন ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে জগদীশচন্দ্র বক্তৃতা দিলেন। উদ্ভিদের সাড়া, আঘাতের ফলে তাদের অনুভূতি প্রকাশ, উদ্দীপক ওষুধ প্রয়োগের ফলে উদ্ভিদ্ দেহে তার প্রতিক্রিয়া প্রত্যেকটি পরীক্ষা অতি সাফল্যের সঙ্গে প্রদর্শিত হল। এর পর বিষ প্রয়োগের ফলে উদ্ভিদের মৃত্যুযন্ত্রনা যখন জগদীশচন্দ্রের যন্ত্রে রেখাঙ্কিত হতে লাগল তখন সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলী বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে গেল।

বক্তৃতা শেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে উঠে অধ্যাপক মোলিশ জগদীশচন্দ্রের ভূয়সী প্রশংসা করে বললেন যে উদ্ভিদ নিজের থেকে তার জীবন রহস্য যে জানিয়ে দিতে পারে তা তাঁদের কাছে ছিল কল্পনারও অতীত। সেই জিনিস চোখের সামনে প্রত্যক্ষ করে তিনি ও তার সতীর্থগণ জগদীশচন্দ্রের কাছে কৃতজ্ঞ। জগদীশচন্দ্র অনুমতি দিলেন ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয় রেখাঙ্কিত লিপিগুলি তাদের রক্ষণশালায় মহামূল্য বস্তু হিসেবে রেখে দেবেন। অন্যান্য জার্মান শারীরবিজ্ঞানীগণও জগদীশ-চন্দ্রের আবিষ্কারের ভূয়সী প্রশংসা করলেন। তাদের মধ্যে ফেফার নামে একজন অধ্যাপক জার্মানীতে গিয়ে তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দেবার জন্য জগদীশচন্দ্রকে অনুরোধ করলেন। উদ্ভিদ্দেহের অনুভূতি সম্বন্ধে অধ্যাপক ফেফার ইতিপূর্বে যে মতবাদ পোষণ করতেন এবং প্রচার করতেন জগদীশচন্দ্র তা ভুল প্রমাণ করলেন তাঁর পরীক্ষার মাধ্যমে। ফলে জগদীশচন্দ্রের মনে হয়ে ছিল অধ্যাপক ফেফার বোধ হয় আন্তরিকভাবে তাঁকে আমন্ত্রণ জানাননি কিন্তু এক সহকারী ছাত্রের কাছ থেকে জগদীশচন্দ্র জানতে পারলেন যে ওই অধ্যাপক জগদীশচন্দ্রকে সকলের থেকে বেশী শ্রদ্ধা ও সমীহ করেন। ওই অধ্যাপক কথাপ্রসঙ্গে বললেন যে উদ্ভিদ্ দেহের যে রহস্যের সন্ধান জগদীশচন্দ্র তাঁর বক্তৃতা ও পরীক্ষার মাধ্যমে দিলেন তা তিনি ভালভাবে অনুধাবন করতে পেরেছেন।

ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে জগদীশচন্দ্রের ওই সাফল্যে কৃতজ্ঞতার চিহ্ন হিসেবে ওই বিশ্ববিদ্যালয় ভারত সরকারকে ধন্যবাদ জানাল। ইম্পিরিয়াল জার্মান গভর্নমেণ্ট তখন প্রতি বৎসর বিজ্ঞান বিষয়ে একটি করে বই প্রকাশ করতেন। ওই বইতে উদ্ভিদবিদ্যা সম্বন্ধে জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার প্রকাশিত হল এবং সম্পাদকীয় লেখায় ওই আবিষ্কারকে তখনকার দিনের বিজ্ঞানের সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কার বলে আখ্যায়িত করা হল।

ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে যেদিন জগদীশচন্দ্র বক্তৃতা করেন তার পরদিনই অধ্যাপক মোলিশ জগদীশচন্দ্র এবং তাঁর সহকর্মীদের ভিয়েনার ঐতিহাসিক স্থানগুলি দেখাবার জন্য নিয়ে গেলেন। ভিয়েনায় অবস্থিত ক্যালিসবার্গের একটা উঁচু স্থান থেকে দানিয়ুব নদীর মনোরম দৃশ্য দেখে জগদীশচন্দ্র এবং তাঁর সহকর্মীরা মুগ্ধ হলেন। ক্যালিসবার্গে বসে অধ্যাপক মোলিশ তাঁদের বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু সমস্যা এবং তৎকালীন জার্মান সম্রাট সম্বন্ধে জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে আলোচনা করলেন। এই ঘটনার দ্বারাই প্রমাণিত হয় পৃথিবীর জ্ঞানী এবং গুণীরা জগদীশচন্দ্রকে অত্যন্ত সম্ভ্রম করতেন এবং তাঁর গুরুত্ব দিতেন।

প্যারিসে জগদীশচন্দ্র

এর আগে জগদীশচন্দ্র প্যারিসে দুই দুইবার বক্তৃতা দিয়ে গিয়েছেন। সুতরাং প্যারিসের বৈজ্ঞানিক মহলে জগদীশচন্দ্র অপরিচিত ছিলেন না। ইতিপূর্বে ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে সরবোনের বিজ্ঞান একাডেমিতে এবং প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে জগদীশচন্দ্র তাঁর উদ্ভাবিত বৈদ্যুতিক তরঙ্গের আবিষ্কার সম্বন্ধে বক্তৃতা করে গিয়েছেন। সেই সময় পঁয়কারে, করনু, মাসকার্ট, লিপ্‌ম্যান, কইলেটেট, বেন কোয়েরেল প্রভৃতি ফরাসী বিজ্ঞানীগণ জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কারে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে বিশেষ সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেছিলেন। সেই যুগে ফরাসী বিজ্ঞান একাডেমির সভাপতি ছিলেন করনু। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী হিসেবে তাঁকে সকলে জানতেন। সেই মণীষী বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কারের পরীক্ষা দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। সেই বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্রের ভূয়সী প্রশংসা করে তাঁকে একখানি চিঠি লেখেন। সেই চিঠির মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল এই যে জগদীশচন্দ্র যে দেশের প্রতিনিধিত্ব করছেন সেই দেশ প্রাচীন সংস্কৃতি ও সভ্যতায় ঐতিহ্য-

মণ্ডিত। জগদীশচন্দ্র সেই সভ্যতারই ধারক এবং বাহক। সবশেষে তিনি জগদীশচন্দ্রকে অকুণ্ঠ প্রশংসা করে লিখেছিলেন যে জগদীশচন্দ্রের কার্যাবলীতে তিনি এবং তাঁর দেশবাসী অত্যন্ত আনন্দিত।

এম্. পঁয়কারে ছিলেন ফরাসীদেশের তৎকালীন প্রেসিডেণ্টের সহোদর ভাই। তখনকার দিনে ফরাসী দেশে তিনি একজন দার্শনিক বিজ্ঞানী হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন। সেই পঁয়কারে তাঁর রচিত "বৈদ্যুতিক তরঙ্গ" নামক বইয়ে বৈদ্যুতিক তরঙ্গের আবিষ্কারে জগদীশচন্দ্রের মৌলিক অবদানের কথা সপ্রশংস উল্লেখ করেছেন। এবার যে সব বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্রের বক্তৃতা শুনবার জন্য সমবেত হলেন তাঁরা জগদীশচন্দ্রকে পদার্থবিজ্ঞানী হিসেবেই জানতেন কিন্তু এবার তাঁরা জগদীশচন্দ্রকে উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিদ হিসেবে দেখে বিস্মিত হয়ে গেলেন। তাঁর বক্তৃতা বিজ্ঞানীমহলে এতটা প্রভাব বিস্তার করেছিল যে তাঁরা ফরাসীদেশের তখনকার দিনের এক বিখ্যাত বিজ্ঞান পত্রিকার সম্পাদককে জগদশচন্দ্রের বক্তৃতা শুনবার জন্য উপস্থিত থাকতে অনুরোধ করলেন।

প্যারিসের এই পরীক্ষা বিশেষ এক কারণে স্মরণীয় হয়ে আছে। বক্তৃতার শুরুতে জগদীশচন্দ্র তাঁর যন্ত্রপাতির সাহায্যে উদ্ভিদের অনুভূতির ব্যাপারটা সুন্দরভাবে দর্শক মণ্ডলীর সামনে উপস্থাপিত করলেন। এর পর উদ্ভিদ্ দেহে পটাসিয়াম সায়ানাইড বিষ প্রয়োগ হল। কিন্তু উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলী অবাক হয়ে গেলেন এই দেখে যে বিষক্রিয়ায় সেই উদ্ভিদের মৃত্যুত হলই না বরং উদ্ভিদ্ যেন আগের থেকে আরও সতেজ হয়ে উঠল। তখন জগদীশচন্দ্রের একজন সহকারী আরও একটু বেশী পরিমাণে পটাসিয়াম সায়ানাইড বিষ ওই উদ্ভিদ্ দেহে প্রয়োগ করলেন। দেখা গেল তাতেও উদ্ভিদ্ দেহে কোন প্রতিক্রিয়া ঘটল না। সেই সহকারী তখন জিভ দিয়ে সেই সায়ানাই-ডের স্বাদ নিতে গিয়ে দেখলেন যে ওটি চিনির মত মিষ্টি স্বাদের, পটাসিয়াম সায়ানাইডের কোন ধর্ম বস্তুটিতে নেই। সৌভাগ্যবশত জগদীশচন্দ্রের কাছে ক্লোরফর্ম মজুত ছিল। তা প্রয়োগ করাতে গাছ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল।

পটাসিয়াম সায়ানাইডের চিনিতে রূপান্তরিত হওয়ার কারণ ছিল।

প্যারিসে পরীক্ষা দেখাবার জন্য প্রয়োজনীয় পটাসিয়াম সায়ানাইডের অভাব দেখা দেওয়াতে জগদীশচন্দ্রের সহকারীরা ওই বস্তুটি সংগ্রহ করতে সচেষ্ট হলেন। কিন্তু ডাক্তারের সার্টিফিকেট ছাড়া ওই মারাত্মক বিষ সংগ্রহ ছিল সাধ্যের অতীত। তাঁরা যখন পটাসিয়াম সায়ানাইড সংগ্রহ করতে উদ্যোগ নিয়েছিলেন তখন প্যারিসে তাঁদের বাড়ীওয়ালার এক মেয়ে স্বেচ্ছায় ওই বিষাক্ত পদার্থটি-সংগ্রহ করে দিতে চাইল। বলল সে পাশ্ববর্তী এক ওষুধের দোকান থেকে সহজেই ওই রাসায়নিক পদার্থটি জোগাড় করে দেবে, এতে কোন ডাক্তারের সার্টিফিকেটের প্রয়োজন হবে না, সেই মেয়েটি ওষুধের দোকানে পটাসিয়াম সায়ানাইড চাইতে দোকানের এক মহিলা কর্মী মেয়েটির কথা বিশ্বাস করলেন না, ভাবলেন নিশ্চয়ই মেয়েটি জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে হতাশ হয়ে পড়েছে, তাই-আত্মহনন করবার জন্যই সে ওই মারাত্মক বিষাক্ত দ্রব্যটি কিনতে চাইছে। কিন্তু দোকানের মহিলা কর্মীটি-তাঁর এই মনোভাবের কথা ব্যক্ত না করে চিনির একটা দ্রবণ তৈকি করে মেয়েটির হাতে দিয়ে দিল। সুতরাং চিনির দ্রবণ উদ্ভিদের উপর প্রয়োগ করলে তার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ উদ্ভিদের জীবনহানি হবে না এটাইত স্বাভাবিক।

লণ্ডনের ময়দাভেল পরীক্ষাগারে-

কিছুদিনের মধ্যেই জগদীশচন্দ্র বিলেত থেকে একটা টেলিগ্রাম পেলেন। ওই টেলিগ্রামে তৎকালীন ভারত সচিব লর্ড ক্রু জগদীশচন্দ্রকে লণ্ডনে ফিরে যাবার জন্য অনুরোধ করেছেন। ইতিপূর্বে লর্ড ক্রুর কাছে বিলেতের খাতনামা বিজ্ঞানীগণ জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কারের কাহিনী বলেছেন এবং তাঁর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। তাতে কৌতুহলী ক্রু লণ্ডনের ময়দাভেল পরীক্ষাগারে জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কারের কাহিনী স্বকর্ণে শুনতে চান। জগদীশচন্দ্র ঠিক করেছিলেন ২রা আগষ্ট জার্মানীর বন শহরে সদলবলে যাত্রা করবেন কারণ আগের থেকেই ঠিক হয়েছিল জগদীশচন্দ্র ৪ঠা আগষ্ট থেকে জার্মানীর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা করবেন। কিন্তু ৪ঠা আগষ্ট থেকে বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। ফলে জগদীশচন্দ্রের আর সে যাত্রা জার্মানী যাওয়া হল না।

লণ্ডনের রয়াল সোসাইটির সভাপতি তখন বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী স্যার উইলিয়াম ক্রুকস্। প্রায় পঞ্চাশ বছর যাবৎ ক্রুকস্ নিরলস পরিশ্রম করে আসছেন বিজ্ঞানে নতুন নতুন আবিষ্কার করবার জন্য। ওই সুদীর্ঘ সময়ের সাধনার ফলও তিনি পেয়েছেন। তাঁরই আবিস্কৃত "ক্রুকস্ টিউব" ই রঞ্জন রশ্মি এবং ইলেক্ট্রন আবিষ্কারের সূত্রপাত করে। ইতিপূর্বে ১৮৯৫ এবং ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে জগদীশচন্দ্র যখন লণ্ডনের রয়াল সোসাইটিতে বক্তৃতা করেছিলেন তখন স্যার উইলিয়াম ক্রুকস্ সেই দুইটি সভাতেই উপস্থিত থেকে জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কারের কাহিনী শুনেছিলেন। স্যার উইলিয়াম ক্রুকস্ এইবার জগদীশচন্দ্র উদ্ভাবিত "প্ল্যাণ্ট অটোগ্রাফস" যন্ত্রে গাছের অনুভূতির রেখাঙ্কন প্রত্যক্ষ করবার জন্য ময়দাভেল পরীক্ষাগারে এলেন।

জগদীশচন্দ্র ঠিক করেছিলেন যে তাঁর নব আবিস্কৃত "কণ্ট্রোল অফ্ নার্ভাস ইম্পালস" যন্ত্রটি রয়াল সোসাইটিতে প্রথম পরীক্ষা করে দেখাবেন। রয়াল সোসাইটির তৎকালীন সম্পাদক ছিলেন রোজ ব্রাডফোর্ড। তিনি ছিলেন একজন শারীরতত্ত্ববিদ। তাঁকে সঙ্গে করে স্যার উইলিয়াম ক্রুকস্ ময়দাভেল পরীক্ষাগারে এলেন। তাঁদের সামনে অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে জগদীশচন্দ্র "কণ্ট্রোল অফ্ নার্ভাস ইম্পালস" যন্ত্রটি পরীক্ষা করে দেখালেন। এই যন্ত্রের পরীক্ষা দেখে ক্রুক্স্ এতটা মুগ্ধ হয়েছিলেন যে তিনি একটি পত্র লিখে জগদীশচন্দ্রকে তাঁর ওই মনোভাবের কথা জানিয়েছিলেন। ওই-পত্রে তিনি এও বলেছিলেন যে উদ্ভিদ দেহের অনুভূতি জগদীশচন্দ্র পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত করলেন বিশ্বের বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তার ফল হবে সুদূর প্রসারী। ওই পত্রের মাধ্যমে স্যার উইলিয়াম ক্রুকস্ একথাও জানিয়ে দিলেন যে তিনি তখনকার দিনের অন্যতম বিখ্যাত বিজ্ঞান পত্রিকা "কেমিক্যাল নিউজে" জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কারের কাহিনী প্রকাশ করবেন সবিস্তারে।

এই ঘটনার কয়েকদিন পরই জগদীশচন্দ্র রয়াল সোসাইটিতে "কণ্ট্রোল অফ নার্ভাস ইম্পালস" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। ওই বক্তৃতা

শুনে এবং জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কৃত ওই যন্ত্রের পরীক্ষা দেখে উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলী মুগ্ধ হয়ে গেলেন।

উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিদ জগদীশচন্দ্র

১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে যখন জগদীশচন্দ্র দ্বিতীয়বার রয়াল ইনস্টিটিউশনে বক্তৃতা করেন তখনই তিনি উদ্ভিদ্‌দেহের বিভিন্ন অংশের বৈদ্যুতিক উত্তেজনার ফলে সাড়া দেওয়ার ঘটনাটা বলেন। তিনি বলতে চাইলেন যে উদ্ভিদ্‌দেহ, প্রাণিশরীর এবং অজৈব বস্তু এদের প্রত্যেকের মধ্যেই বৈদ্যুতিক উত্তেজনা ঘটালে একই রকম সাড়া লক্ষ্য করা যায়।

এরপর প্রায় ত্রিশ বছর ধরে জগদীশচন্দ্র উদ্ভিদ্ জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে গবেষণা করেছেন। এই সব গবেষণায় তিনি পদার্থ বিদ্যার তত্ত্ব কাজে লাগাতে থাকেন। তাই জগদীশচন্দ্রের এই সব গবেষণাকে উদ্ভিদ্ তত্ত্ববিদদের গতানুগতিক গবেষণার সমপর্যায়ভুক্ত করা যায় না। পদার্থবিদ্যার তত্ত্ব কাজে লাগিয়ে জগদীশচন্দ্র নানা রকম যন্ত্র আবিষ্কার করলেন এবং স্বউদ্ভাবিত ওইসব যন্ত্রের সাহায্যেই তিনি উদ্ভিদ্‌দেহের ক্রিয়া-প্রক্রিয়া মাপতে সক্ষম হন। তাই জগদীশচন্দ্রকে বিশ্বের প্রথম জীবপদার্থ তাত্ত্বিক আখ্যা দেওয়া হয়।

উদ্ভিদ্ বিষয়ে জগদীশচন্দ্রের গবেষণাকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা যায়—(ক) উদ্ভিদ শরীরে যে যে মাধ্যমে (যথা পেশী বা তন্তু) উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে সে বিষয়ে গবেষণা (খ) উদ্ভিদের জলশোষণ এবং (গ) উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও সালোকসংশ্লেষ। উপরিউক্ত প্রত্যেকটি বিষয়েই জগদীশচন্দ্র গবেষণা করে যে তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তা বিজ্ঞান জগতে আজও অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

উদ্ভিদ্‌দেহে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে কেন?

আমাদের কাছে লজ্জাবতী গাছের পরিচয়—এটি একটি অত্যন্ত স্পর্শকাতর গাছ যার পাতা বা ডাল ছুঁয়ে দিলে তৎক্ষণাৎ তা নুইয়ে পড়ে। এই রকম গাছ গাছড়া নিয়ে পাশ্চাত্য দেশের বিজ্ঞানীরা কিছু কিছু গবেষণা ইতিপূর্বে করেছিলেন। পতঙ্গভূক উদ্ভিদ্ নিয়ে বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী ফ্রান্সিস ডারউইন কিছু কাজ করেছিলেন। লজ্জাবতী গ্রীষ্মপ্রধান দেশের গাছ। শীতের দেশে ঐ গাছ হয় না।

তাকে বাঁচানও যায় না। ফলে লজ্জাবতী জাতীয় গাছপালা নিয়ে পশ্চিমের বিজ্ঞানীমহল কোন কাজ করেন নি। এ জাতীয় উদ্ভিদ বাহ্যিক যান্ত্রিক উত্তেজনায় সাড়া দেয়। জগদীশচন্দ্র গবেষণা করে প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করলেন সে বৈদ্যুতিক উত্তেজনাতেও এরা সাড়া দেয়। প্রাণিদেহে যেমন ঘটে উদ্ভিদ্ দেহেও সাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শরীরে বিদ্যুৎ প্রবাহের চলাচল হয় কিনা এবং উদ্ভিদের শরীরে বৈদ্যুতিক উত্তেজনা ঘটালে তাদের শরীরের কোন অংশ দিয়ে সেই উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে কিনা—এসব নিয়েই জগদীশচন্দ্র গবেষণা করতে শুরু করলেন। এই কাজে জগদীশচন্দ্র প্রায় ত্রিশ বছর অনলস পরিশ্রম করেন। প্রথম দরকার হল উত্তেজনা কতটা দ্রুতগতিতে এক স্থান থেকে উদ্ভিদ্ দেহের অন্য স্থানে পেঁ ৗছায় তা পরিমাপ করা। এর আগে কোন গবেষক বিজ্ঞানীই এধরণের যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন করেন নি, কারণ ব্যাপারটাতে পদার্থবিজ্ঞানেও সমধিক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। অন্যান্য উদ্ভিদ্ তাত্ত্বিকদের কাছে সেটা দুরূহ বলে মনে হয়েছিল জগদীশচন্দ্র তা অবলীলাক্রমে করে ফেলেছিলেন কারণ তিনি শুধু উদ্ভিদ্তাত্ত্বিক ছিলেন না। পদার্থবিজ্ঞানেও তাঁর ছিল অসাধারণ জ্ঞান। ঘড়ির ভেতরের কলকব্জা ব্যবহার করে তিনি যে সূক্ষ্ম যন্ত্রটি তৈরি করলেন তার নাম দিলেন "রেজোন্যাণ্ট রেকর্ডার।" লজ্জাবতী গাছের ডগা এমন একটি লিভারের সঙ্গে যুক্ত করে রাখলেন যেটি ভূষোমাখান কাচে একটা নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর ক্রমাগত একই রেখায় কতগুলো বিন্দু এঁকে যেত। যে মুহূর্তে ওই উত্তেজনা পাতার ডগায় পেঁ ৗছাল সেই মুহূর্তটি রেজোন্যাণ্ট রেকর্ডারে ধরা যেত। ওই রেকর্ডার কর্তৃক অঙ্কিত বিন্দু গুণলেই সূক্ষ্ম সময়ের ব্যবধান পাওয়া যেত। বৈদ্যুতিক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়বার সূক্ষ্ম সময় মেপে জগদীশচন্দ্র উদ্ভিদের স্নায়ুতন্ত্রের অস্তিত্ব প্রমাণ করলেন। তখনকার দিনে একটি মতবাদ প্রচলিত ছিল যে উদ্ভিদের দেহে জলের চাপে পরিবর্তনের ফলস্বরূপ উদ্ভিদ্ দেহে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। জগদীশচন্দ্রের উপরিউক্ত

পরীক্ষার ফলে সেই যুক্তি খণ্ডিত হল। এই ঘটনার দীর্ঘদিন পরে ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে জাপানের এক নাম করা বিজ্ঞানী সিবাত্তকা আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে জগদীশচন্দ্রের উপরিউক্ত মতবাদকেই সমর্থন করেছিলেন।

পাশ্চাত্য দেশের বিজ্ঞানীরা প্রাণিদেহের মত উদ্ভিদ্ স্নায়ুতন্ত্রের অস্তিত্ব স্বীকার করতে চাননি। প্রশ্ন দেখা দিল উদ্ভিদ্ দেহে স্নায়ুতন্ত্র থাকলে তা দেহের কোন্ অংশে আছে। গাছের অংশ কেটে নিয়ে তা থেকে খুব পাতলা অংশ কেটে মাইক্রোস্কোপের মধ্যে পরীক্ষার দ্বারাও স্নায়ুতন্ত্রের অস্তিত্ব ধরা পরে না। কিন্তু লজ্জাবতী গাছের পাতা থেকে আড়াআড়ি ভাবে "সেকশন" কেটে দেখা গেল চারটি বড় "ভ্যাস্কুলার বাণ্ড্ল্"। এই বাণ্ড্ল্গুলি আলাদাভাবে এক একটি উপপত্রের সঙ্গে যুক্ত। জগদীশচন্দ্র পরীক্ষা করে দেখালেন সে ওই বাণ্ড্ল্গুলিই উপপত্র এবং পত্রমূলের মধ্যে বৈদ্যুতিক উত্তেজনা চলাচলের পথ। ওই ঘটনাটি প্রমাণ করবার জন্য জগদীশচন্দ্র আর একটা সূক্ষ্ম যন্ত্র আবিষ্কার করলেন এবং তার নাম দিলেন "ইলেক্ট্রিক্ প্রোব।" এটি একটি অত্যন্ত সূক্ষ্ম ছুঁচালো প্লাটিনামে তৈরী যন্ত্র। যন্ত্রটির সঙ্গে বিদ্যুৎজ্ঞাপক গ্যালভানোমিটারের সংযোগ থাকে এবং এটিকে খুব ধীরে এবং অল্পপরিমাণে উদ্ভিদ্দেহে প্রবেশ করান যায়। উদ্ভিদ্ দেহের মধ্যে কতটুকু প্রবেশ করানো হল তাও ওই যন্ত্রে ধরা পড়ল এবং কতটুকু উদ্ভিদ্দেহে প্রবেশ করালে কতটুকু সাড়া পাওয়া যায় তাও ওই যন্ত্রে মাপা সম্ভব হল। এই যন্ত্রদ্বারা জগদীশচন্দ্র প্রমাণ পেলেন যে ভ্যাস্কুলার বাণ্ড্লের মধ্যে অবস্থিত ফ্লোয়েম কোষগুলিই উত্তেজনা পরিবহনের জন্য দায়ী। জগদীশচন্দ্র প্রমাণ করলেন যে জাইলেস স্তরের কিছুটা ভিতর পর্যন্ত ফ্লোয়েমের স্তর আছে, এবং লজ্জাবতীকে যখন স্পর্শ করা হয় তখন বাইরের ফ্লোয়েম স্তর দিয়ে উত্তেজনা পত্রমূলে এসে পৌঁছায়। সেখান থেকে ভিতরের ফ্লোয়েমের পথে পথে সাড়া সৃষ্টি করে পত্রমূলে ফিরে আসে।

প্রাণিদেহের কোন স্থানে পীড়ন ঘটালে সাড়া প্রথম স্নায়ুকেন্দ্রে পৌঁছায় এবং সেখান থেকে প্রতিফলিত হয়ে উত্তেজনা পীড়ন স্থানে পৌঁছালে অনুভূতির সৃষ্টি হয়। এইভাবে প্রাণী সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূতি লাভ করে। স্নায়ুকেন্দ্র ছাড়াও অন্য উপকেন্দ্র থাকে। অনেক সময় উত্তেজনা সেখান থেকেও প্রতিফলিত হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় চোখে কেউ কিছু প্রবেশ করাতে চাইলে ওই দ্রব্যটি চোখকে আঘাত করবার আগেই আমরা চোখ বুজে ফেলি। শারীরতাত্ত্বিকদের ভাষায় এই ঘটনাকে বলে "রিফ্লেক্স আর্ক"। লজ্জাবতী পাতার ডগায় প্রজ্বলিত কোন কিছু ছোঁয়ালে একই রকম ঘটনা ঘটে। "রেজোন্যান্ট রেকর্ডার" নামক যন্ত্র উদ্ভাবন করে জগদীশচন্দ্র এই ঘটনাই প্রমাণ করেছিলেন। দেখিয়েছিলেন অন্তর্মুখী এবং বহির্মুখী এই দু'রকম উত্তেজনাই উদ্ভিদশরীরে প্রবাহিত হয়।

প্রাণিদেহে পেশীতন্তু থাকে। প্রাণিদেহের স্নায়ু দ্বারা উত্তেজনা প্রবাহিত হয়। পেশী সঙ্কোচনশীল। পেশী যখন সঙ্কুচিত হয় তখনই দেহের নানা অংশে নড়াচড়া দেখা দেয়। কোন কোন ক্ষেত্রে বাইরের উত্তেজনায় পেশী সঙ্কুচিত হয়। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে বাইরের উত্তেজনা ছাড়াই পেশী সঙ্কুচিত হয়। উদাহরণ হিসেবে প্রাণীর হৃদ্‌যন্ত্রের উল্লেখ করা যেতে পারে। জগদীশচন্দ্র প্রমাণ করেছেন যে উদ্ভিদদেহেরও অঙ্গসঞ্চালন হয় এবং তার কারণ উদ্ভিদদেহেও সঙ্কোচনশীল তন্তু রয়েছে। তিনি প্রমাণ করেছেন যে, উদ্ভিদের দেহের সঙ্কোচনশীল তন্তুগুলি প্রাণিদেহের পেশীর মতই সব রকমের কার্যকলাপ করে থাকে। লজ্জাবতী লতার শরীরের সঙ্কোচনও খালি চোখেই দেখা যায়, অন্যান্য উদ্ভিদের দেহেও ঐ রকম সঙ্কোচন-শীল তন্তু রয়েছে, তবে তার সঙ্কোচনের মাত্রা কম বলে খালি চোখে ধরা পড়ে না। বিলেতে ময়দাভেলের পরীক্ষাগারে গাজর, বাঁধাকপির টুকরো ইত্যাদি সব রকম উদ্ভিদে উত্তেজনা সৃষ্টি করে প্রমাণ করে দিলেন যে প্রাণিদেহের মতই উদ্ভিদদেহে সাড়া জাগে। উত্তপ্ত করলে

উদ্ভিদ সাড়া দেয়। ঠাণ্ডা করলেও সাড়া দেয় সঙ্কোচনের মাধ্যমে। বিদ্যুৎ শক্তির প্রয়োগে উদ্ভিদে উত্তেজনা জাগে, বিষপ্রয়োগে প্রাণের স্পন্দন স্তব্ধ হয়ে যায়। প্রাণিদেহের সাড়া এবং উদ্ভিদদেহের সাড়া যন্ত্রে রেকর্ড করে সেই সাড়ালিপি পাশাপাশি রেখে জগদীশচন্দ্র প্রমাণ করেন যে সেই সাড়ার ধরন একই।

বনচাঁড়াল গাছের যেকোন ডালে বড় পাতার পরেই নিচের দিকে থাকে ছোট দুটি পাতা, ওই পাতা দুটি সব সময়ই ওপর-নিচে সামান্য ওঠা-নামা করে। জগদীশচন্দ্র স্বউদ্ভাবিত "কাইটোগ্রাফ" নামে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের সাহায্যে বনচাঁড়ালের স্পন্দন রেকর্ড করে প্রমাণ করেন যে ওই স্পন্দন প্রাণিদেহের হৃদ্‌স্পন্দনের সঙ্গে মিলে যায়। প্রাণিদেহের হৃদ্‌স্পন্দনের সাড়া রেকর্ড করা হয় "ইলেক্‌ট্রো-কার্ডিওগ্রাম" নামক যন্ত্র দ্বারা। জগদীশচন্দ্র দেখালেন যে "কাইটোগ্রাফে" লিপিবদ্ধ উদ্ভিদদেহের সাড়া আর "ইলেকট্রো-কার্ডিওগ্রামে" রেকর্ড করা প্রাণিদেহের সাড়ালিপি একই রকমের। তিনি আরও দেখালেন যে প্রাণিদেহের হৃদ্‌যন্ত্রের সঙ্কোচন এবং প্রসারণের যেমন বৈদ্যুতিক সাড়ার সৃষ্টি হয় বনচাঁড়ালের পাতার স্পন্দনের সঙ্গেও তেমনই বৈদ্যুতিক সাড়ার সৃষ্টি হয়।

উদ্ভিদের জল শোষণ

প্রাণীর বেঁচে থাকার জন্য হৃদ্‌পিণ্ডের স্বতঃস্পন্দনের প্রয়োজন রয়েছে। উদ্ভিদের পাতার স্বতঃস্পন্দনের সঙ্গে উদ্ভিদের জীবন ধারণের সম্বন্ধ কি? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হলে গাছের জল শোষণ প্রক্রিয়া বুঝতে হবে। জগদীশচন্দ্র উদ্ভিদকে একটি স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র হিসেবে দেখতেন। এই যন্ত্র নানাবিধ বাহ্যিক উত্তেজনায় সাড়া দেয়। ভূ-অনুবর্তিতার (মাধ্যাকর্ষণ শক্তির ফল) জন্য উদ্ভিদ তার মূলটিকে সর্বদাই মাটির গভীরে প্রবিষ্ট করে। অর্কিড জাতীয় গাছকে মাটি থেকে তুলে ওপরে রাখলেও তার মূল নিচের দিকেই ধাবিত হয়।

আবার আলোকানুবর্তিতার জন্য যেকোন উদ্ভিদের পাতাগুলি সব সময় আলোর দিকেই ধাবিত হয়। ওপরে উল্লিখিত প্রথম ক্ষেত্রে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে আলোক শক্তি এই দু'রকম শক্তির প্রভাবে উদ্ভিদের সাড়া দেওয়ার ঘটনা সূচিত হয়। উদ্ভিদ মাটির নিচের জল শোষণ করে নিজেতে বাঁচিয়ে রাখবে এবং তখনই তন্তুর সঙ্কোচন ঘটে। ঘটনাটা প্রাণিদেহের পেশীর সঙ্কোচনের মতই দাঁড়ায়। জল শোষণ ক্রিয়া উদ্ভিদের জীবন্ত কোষের সঙ্কোচন এবং সম্প্রসারণের ফলেই ঘটে। হৃদ্‌পিণ্ডের স্পন্দন যেমন প্রাণিদেহের জীবন ধারণে প্রয়োজনীয় স্বয়ংক্রিয় কার্য তেমনি উদ্ভিদের জল শোষণও জীবন্ত উদ্ভিদ কোষের সঙ্কোচন এবং প্রসারণের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয় কার্য।

উদ্ভিদের জল শোষণ ব্যাপারটি কোন কোন বিজ্ঞানী যান্ত্রিক ঘটনা বলে প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন। তাঁদের মতে পাতার কোষ থেকে জল বাষ্প হয়ে উঠে যায়, তখন পাতার অবশিষ্ট কোষ থেকে জল আগের জলের স্থান গ্রহণ করে। সেই জল যখন বাষ্প হয়ে উঠে যায় উদ্ভিদের পরবর্তী অংশ থেকে জল পাতায় উঠে আসে। এইভাবে শেষ পর্যন্ত উদ্ভিদের মূল থেকে জল উঠে আসে। জগদীশচন্দ্র পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করলেন যে জল শোষণের হার অত্যন্ত কম। চন্দ্রমল্লিকা গাছের ক্ষেত্রে জল শোষণের গতি ঘণ্টায় আঠার মিটার। অপর উদ্ভিদের ক্ষেত্রে তা ঘণ্টায় সত্তর মিটারও হয়। তখনকার দিনে একটি প্রচলিত মতবাদ ছিল যে, অসমোটিক বা আস্রাবণ প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদের জল শোষণ ঘটে। অন্য মতবাদ ছিল, বায়ুর চাপ বা শেকড়ের চাপ বা কৈশিক নলের মাধ্যমে জল প্রবাহ। জগদীশচন্দ্র পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করলেন যে এর কোনটাই যুক্তিগ্রাহ্য নয়।

জল শোষণের হার মাপবার জন্য জগদীশচন্দ্র সে যন্ত্রটি উদ্ভাবন করেছিলেন তার নাম দিয়েছিলেন "পটোগ্রাফ"। উদ্ভিদ যে হারে জল শোষণ করে তা একটি ভূষো মাখান কাঁচের প্লেটে বিন্দু

ধরা পড়ছে। ইংরেজি U-আকার বিশিষ্ট নলের একটি বাহুর মধ্যে উদ্ভিদটি আটকান থাকে। উদ্ভিদটি যে হারে জল শোষণ করবে সেই হারেই U-টিউবের অন্য বাহুতে রক্ষিত ভাসমান ক্ষুদ্র কাঁচের নলটি নিচে নামবে। সঙ্গে সঙ্গে হালকা লিভারের অপর প্রান্ত ওপর দিকে উঠবে। ঘড়িকলের সঙ্গে লাগান ভূষো মাখান কাঁচের প্লেট মাপা গতিতে এক দিকে সরে যেতে নিয়মিত সময় অন্তর এগিয়ে এসে নিজের দেহে লিভারের ছোঁয়াটুকু নিয়ে পেরিয়ে যাচ্ছে। স্পর্শটুকু ভূষোর গায়ে সাদা বিন্দু এঁটে দিচ্ছে। U-টিউবে রক্ষিত জলে নানাপ্রকার রাসায়নিক দ্রব্য প্রয়োগ করে জল শোষণের হারের ওপর তার প্রভাব লক্ষ্য করা গেল। আবার দেখা গেল একটা নির্দিষ্ট তাপমাত্রার নিচে জল শোষণ ক্রিয়া থেমে যায়। আবার একটা নির্দিষ্ট উষ্ণতায় শোষণের বেগ সর্বাধিক হয়। জলে সামান্য অবসাদক দ্রব্য মিশিয়ে দিলে শোষণের হার বৃদ্ধি পায়। ওই অবসাদক রাসায়নিক বস্তুটির পরিমাণ বেশী হয়ে গেলে শোষণ প্রক্রিয়াটি একেবারেই বন্ধ হয়ে যায়। তখন উদ্ভিদের মৃত্যু ঘটে। এই সব পরীক্ষা দ্বারা জগদীশচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করেন যে উদ্ভিদের জল শোষণ ক্রিয়া শারীরবৃত্তীয় ঘটনা, যান্ত্রিক ঘটনা নয়।

প্রাণিদেহের কোষের মধ্যে বিদ্যুৎপ্রবাহের মাত্রা কমবেশী করে বৈদ্যুতিক সাড়া পাওয়া যায়। উদ্ভিদের ক্ষেত্রেও যে একই ঘটনা ঘটে তা জগদীশচন্দ্র প্রমাণ করেছিলেন তাঁর উদ্ভাবিত “ইলেকট্রিক্ প্রোব” যন্ত্রের সাহায্যে। সাধারণ উদ্ভিদের ক্ষেত্রে ওই যন্ত্র দ্বারা জগদীশচন্দ্র প্রমাণ করলেন যে বনচাঁড়ালের পাতা যেমন কাঁপে যা কিনা খালি চোখেই দৃশ্যমান, সাধারণ উদ্ভিদের মধ্যেও এমন কোষ রয়েছে যা সামান্য মাত্রায় হলেও বনচাঁড়ালের মতই স্পন্দিত হয়। “প্ল্যান্ট স্ফিগ্‌মোগ্রাফ্” নামে এক যন্ত্র উদ্ভাবন করে জগদীশচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করলেন যে উদ্ভিদের জীবন্ত কোষের স্পন্দন শক্তিই উদ্ভিদের জল শোষণ ক্রিয়ার সঙ্গে প্রত্যক্ষ ভাবে যুক্ত। জগদীশচন্দ্রের পরবর্তী

কালের কয়েকজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানীও তাঁদের পরীক্ষা দ্বারা জগদীশচন্দ্রের মতবাদেরই সমর্থন পেয়েছিলেন। কিন্তু আচার্য জগদীশচন্দ্রই বিশ্বের প্রথম বিজ্ঞানী যিনি যন্ত্রের সাহায্যে উদ্ভিদের জল শোষণ ক্রিয়ার তত্ত্বটি প্রমাণ করেছিলেন।

সালোকসংশ্লেষ

শক্তিই সব জীবের বেঁচে থাকার চাবিকাঠি। এই শক্তিকে খরচ করেই জীব তার দৈনন্দিন শারীরবৃত্তীয় কার্য সম্পাদন করে থাকে। প্রাণীরা গাছপালা বা অন্য প্রাণীর শরীর আত্মসাতের মাধ্যমে জীব-রসায়ন পদ্ধতিতে শক্তি সংগ্রহ করে। উদ্ভিদ বেঁচে থাকার জন্য সৌর শক্তিকে কাজে লাগায়। এই সৌর শক্তিকে উদ্ভিদ রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত করে। যে পদ্ধতিতে উদ্ভিদ সৌর শক্তিকে কাজে লাগিয়ে নিজ দেহের পুষ্টিলাভ করে তাকে বলে সালোকসংশ্লেষ বা ফটোসিন্থেসিস্। সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ার ফলে উদ্ভিদ বায়ু থেকে সংগৃহীত কার্বন ডাইঅক্সাইড আর মাটি থেকে শোষিত জলের সাহায্যে নিজ দেহের জন্য প্রয়োজনীয় কার্বোহাইড্রেট বা শর্করা সৃষ্টি করে। উদ্ভিদ ক্লোরোফিল নামক পদার্থের মাধ্যমে সৌর শক্তি সংগ্রহ করে। এই সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়াটি নিয়ে জগদীশচন্দ্র অনেক মৌলিক গবেষণা করেছেন। তারজন্য তিনি অনেক সূক্ষ্ম যন্ত্রের উদ্ভাবন করেছিলেন। এই সব যন্ত্রের মধ্যে সব থেকে উল্লেখযোগ্য ছিল "ফটোসিন্থেটিক্ বাবলার"। ওই যন্ত্রের সাহায্যে কত গ্রাম কার্বোহাইড্রেট তৈরি করতে কত ক্যালোরি পরিমাণ সৌর শক্তি প্রয়োজন তার পরিমাপ করা যেত। এই যন্ত্রের সাহায্যে জগদীশচন্দ্র প্রমাণ করেছেন যে বিভিন্ন ঋতুতে সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় একই পরিমাণ সৌর শক্তি সংগ্রহ করে উদ্ভিদ বিভিন্ন পরিমাণ কার্বোহাইড্রেট উৎপন্ন করে। আলোর তীব্রতার ওপর সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়া নির্ভর করে না। তবে তীব্র আলোতে রেখে দিলে উদ্ভিদ

অবসন্ন বোধ করে। কিন্তু সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়া শুরু হওয়াটা আলোর তীব্রতার ওপর নির্ভর করে। "হাইড্রিলা" নামে একরকম উদ্ভিদের ওপরে পরীক্ষা করে জগদীশচন্দ্র প্রমাণ করলেন যে শীতকালে সালোকসংশ্লেষ শুরু হতে যে পরিমাণ আলোর তীব্রতা প্রয়োজন বসন্ত কালে তার চাইতে কম আলোর তীব্রতা প্রয়োজন। সালোকসংশ্লেষের ওপর সূর্যের বিভিন্ন বর্ণালীর প্রভাব, সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় ক্লোরোফিল এবং কার্বন ডাইঅক্সাইডের আনুপাতিক পরিমাণ, সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ার ওপর তাপমাত্রার প্রভাব, উত্তেজক এবং বিষাক্ত দ্রব্য প্রয়োগে সালোকসংশ্লেষের পরিবর্তন ইত্যাদি জগদীশচন্দ্র তাঁর মৌলিক গবেষণা দ্বারা নির্ণয় করেছেন।

জগদীশচন্দ্রের আরও কয়েকটি আবিষ্কারও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি প্রমাণ করেছিলেন যে বৃষ্টিপাতের পরেই সালোকসংশ্লেষের মাত্রা বেড়ে যায়। বৃষ্টিপাতের সময়ে বাতাসে নাইট্রোজেন থেকে নাইট্রিক অ্যাসিড তৈরি হয়। বৃষ্টির জলের সঙ্গে সেই নাইট্রিক অ্যাসিড ভূপৃষ্ঠে নেমে আসে। আর তারই ফলে উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষের পরিমাণ বেড়ে যায়।

জগদীশচন্দ্র সম্পর্কে বিশ্বখ্যাত মনীষীদের উক্তি

"লণ্ডন ডেইলি নিউজের" তৎকালীন সম্পাদক গার্ডনার একদিন এসে ময়দাভেল গবেষণাগার দেখে গিয়ে তাঁর পত্রিকায় অত্যন্ত প্রশংসাসূচক এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লেখেন। তিনি প্রবন্ধের নামকরণ করেন "হিউম্যান প্ল্যান্ট"। তাতে তিনি পাঠকবৃন্দের কাছে অকপটে স্বীকার করেন যে জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার মানুষকে চমকে দেবে। জগদীশচন্দ্রের পরীক্ষাগার দর্শন করলে পাঠকবৃন্দ দেখতে পাবেন যে প্রাণীরা যেমন নানাভাবে জীবনের লক্ষণ প্রকাশ করে উদ্ভিদরাও তাই করে।

বিলেতের তৎকালীন বিখ্যাত সাহিত্য ম্যাগাজিন "নেশনের"

সম্পাদক মিঃ ম্যাসিংহাম জগদীশচন্দ্রের ময়দাভেল গবেষণাগার দেখে এসে সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখলেন গাছপালা যে জীবন্ত প্রাণীর মত বাহ্যিক পীড়নে সাড়া দেয় তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রাচ্যের বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র হাতে কলমে পরীক্ষা করে দেখালেন।

জর্জ বার্নার্ড শ ইংরেজি সাহিত্যে একজন নামকরা ব্যক্তিত্ব। মনীষী প্রাবন্ধিক হিসেবেও তিনি স্মরণীয়। ওই বার্নার্ড শ মাছ-মাংস খেতেন না। কারণ জীবহত্যা তিনি একেবারেই বরদাস্ত করতে পারতেন না। এইজন্য মনে মনে তিনি আত্মপ্রসাদ লাভ করতেন। কিন্তু ময়দাভেল পরীক্ষাগারে এসে যখন তিনি দেখলেন যে উদ্ভিদও প্রাণীদেরই মত জীবন্ত আর এক প্রজাতি যা বাহ্যিক আঘাতে উপযুক্ত সাড়া দেয় তখন তিনি দুঃখিত হলেন। ভাবলেন এত দিন এই গাছপালা আহার করেই তিনি পুষ্টিলাভ করেছেন। আর সেই গাছপালা তো প্রাণীদেরই আর এক প্রজাতি।

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিজ্ঞানী অধ্যাপক গিলবার্ট মারে ময়দাভেল পরীক্ষাগারে জগদীশচন্দ্রের পরীক্ষা দেখে অভিভূত হয়েছিলেন। তিনি তাঁর মনের কথা একটা পত্রের মাধ্যমে জগদীশচন্দ্রকে জানিয়ে দেন। সেই চিঠিতে তিনি লেখেন যে তিনি দু'দু'বার রয়াল ইনস্টিটিউশনে জগদীশচন্দ্রের বক্তৃতা অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে অনুধাবন করার চেষ্টা করেছেন। এতে তাঁর উপলব্ধি হয়েছে যে অত্যন্ত শ্রম এবং নিষ্ঠা আছে বলেই জগদীশচন্দ্র উদ্ভিদ সম্বন্ধে নতুন আবিষ্কার করতে পেরেছেন। অধ্যাপক মারের মত, জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার পৃথিবীকে জ্ঞানের এক আশ্চর্য স্থানে প্রতিষ্ঠিত করবে।

"মেটাফিজিক্স অফ নেচার" নামক বিখ্যাত পুস্তকের রচয়িতা অধ্যাপক কার্ভেথ রীড তাঁর পুস্তকে মন্তব্য করেছেন জীবের মত জড়ও যে সাড়া দেয় তা জগদীশচন্দ্র প্রমাণ করেছেন।

তৎকালীন ভারত সচিব লর্ড ক্রু ময়দাভেলে জগদীশচন্দ্রের

পরীক্ষাগার দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। তিনি ইণ্ডিয়া অফিসের সব কর্মচারী এবং সেক্রেটারীদেরকে পরামর্শ দিলেন ঐ পরীক্ষাগার দর্শন করতে। ময়দাভেলে জগদীশচন্দ্রের পরীক্ষাগার দেখার পর লর্ড ক্র বললেন যে, জগদীশচন্দ্রের কাজে ভারত সরকার গর্বিত। পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক উন্নতিতে ভারতবর্ষের এই অবদানে তিনি ব্যক্তিগতভাবে আনন্দিত এ কথাও তিনি জগদীশচন্দ্রকে জানিয়ে দিলেন।

আমেরিকায় জগদীশচন্দ্র

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয় ১৯১৪ খ্রীস্টাব্দের ৪ঠা আগস্ট। যুদ্ধ শুরু হওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই সমরানলের লেলিহান শিখা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তকে গ্রাস করতে উদ্যত হল। মাত্র তিন মাসের মধ্যে জার্মানরা একটি যুদ্ধ জাহাজ এবং কয়েকটি মালবাহী জাহাজ ইংলিশ চ্যানেলে সাবমেরিন দিয়ে ডুবিয়ে দিল। এর পরে পরেই জার্মানরা টর্পেডোর সাহায্যে আটলান্টিক মহাসাগরে "লুসিটানিয়া", "দি আরেবিক" এবং "দি সিমরিক" নামে আরও তিনখানি জাহাজ ধ্বংস করে দেয়। সুতরাং আটলান্টিক মহাসাগর দিয়ে যাওয়া ভয়ানক বিপজ্জনক হয়ে উঠল। আগে ঠিক ছিল জগদীশচন্দ্র ওই তিনখানি জাহাজের কোন একটিতে করেই আমেরিকা যাবেন। ওপরে উল্লিখিত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নতুন করে চিন্তা-ভাবনা শুরু হল। অবশেষে ঠিক হল জগদীশচন্দ্র "ফিলাডেলফিয়া" নামক জাহাজে করেই আমেরিকা যাবেন। "ফিলাডেলফিয়া" ঠিক সমুদ্রগামী জাহাজ ছিল না। নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সময়ে জাহাজ ছাড়ল। সেই জাহাজে জগদীশচন্দ্রের সহযাত্রী হল একজন আমেরিকাবাসী ধনী ব্যবসায়ী। ভদ্রলোক নিজের দেশ এবং স্বজাতি সম্বন্ধে গর্বিত। তিনি জগদীশচন্দ্রের কাছে প্রায়ই এসে গল্প করতেন এবং বলতেন যে পৃথিবীতে যত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হয়েছে তার বেশীর ভাগই নাকি হয়েছে আমেরিকায় অবস্থিত তাঁর জন্মভূমি "মেরিল্যাণ্ডে"। সামরিক অস্ত্র নির্মাণে

আমেরিকা যেসব দেশের থেকে এগিয়ে রয়েছে সে কথাও ভদ্রলোক জগদীশচন্দ্রকে মনে করিয়ে দিত। ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলে জগদীশচন্দ্র কৌতুক অনুভব করতেন। যাই হোক, এইভাবে জাহাজের মধ্যে জগদীশচন্দ্রের সময় কাটতে লাগল। অবশেষে নভেম্বর মাসের শেষ দিকে জগদীশচন্দ্র সদলবলে নিউইয়র্ক এসে উপস্থিত হলেন। ইতিমধ্যেই আমেরিকার কয়েকখানি সংবাদপত্র ফলাও করে জগদীশ-চন্দ্রের যুগান্তকারী আবিষ্কারের কাহিনী প্রকাশ করেছে।

তখনকার দিনে আমেরিকার বেশীর ভাগ বিজ্ঞানী অধ্যাপকই শিক্ষালাভ করেছেন জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে আর জগদীশচন্দ্রের নতুন আবিষ্কার জার্মান অধ্যাপকদের প্রতিষ্ঠিত মতবাদের বিরোধী। সুতরাং জগদীশচন্দ্রকে কঠোর বিরোধিতার মুখোমুখি হওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে হল।

আমেরিকায় জগদীশচন্দ্র প্রথম বক্তৃতা করেন কলম্বিয়া বিশ্ব-বিদ্যালয়ে। পৃথিবীর মধ্যে সব থেকে খরচ বহুল বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে তখন ফিলাডেলফিয়া বিশ্ববিদ্যালয় পরিচিত। তখনকার আমলে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক ব্যয় ছিল সাত কোটি টাকা। গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ পেতে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত গবেষকদের কোনই অসুবিধা হত না। জগদীশচন্দ্র তাঁর উদ্ভাবিত যন্ত্রের সাহায্যে উদ্ভিদের জীবনের ওপর নানারকম পরীক্ষা করে বক্তৃতা দিলেন। ওই বক্তৃতায় সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলী মুগ্ধ হয়ে গেলেন। কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতি গ্রীষ্মে নতুন কোন আবিষ্কৃত তথ্যের ওপরে আলোচনা করবার জন্য একটা কোর্স পরিচালিত হত। সেই কোর্সে বক্তৃতা দেবার জন্য জগদীশচন্দ্র আমন্ত্রিত হলেন। তাঁর বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল গাছের সাড়ার ব্যাপারে বৈদ্যুতিক উত্তেজনার ভূমিকা। জগদীশচন্দ্রের ওই বক্তৃতা বিজ্ঞানী মহলে এতটা প্রভাব বিস্তার করেছিল যে বক্তৃতার পর তাঁরা জগদীশচন্দ্রের সাক্ষাৎ প্রার্থী হলেন, বক্তৃতার বিষয়বস্তু নিয়ে আরও আলোচনা করবার জন্য। ওই

আগন্তুকদের মধ্যে বিশ্ববিখ্যাত রক্‌ফেলার ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক লোয়েবও ছিলেন।

কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার বিষয়ে পরীক্ষার সাফল্য দেখে ঐ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জগদীশচন্দ্রকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে একখানি পত্র লেখেন। তাতে তিনি জগদীশচন্দ্রকে জানান যে, কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা জগদীশচন্দ্রের বক্তৃতায় গভীর ভাবে আকৃষ্ট হয়েছে। উদ্ভিদের ভেতরকার হ্রাস-বৃদ্ধি এবং উদ্ভিদদেহের সঙ্কোচন ও প্রসারণ প্রদর্শন করবার জন্য জগদীশচন্দ্র যেসব সূক্ষ্ম যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন তা দেখে ছাত্ররা মুগ্ধ হয়েছে। জগদীশচন্দ্র কর্তৃক প্রদত্ত বৈজ্ঞানিক তথ্য ছাত্ররা দ্বিধাহীন ভাবে মেনে নিয়েছে। জগদীশচন্দ্রের আগে আর কোন উদ্ভিদবিজ্ঞানী বৃক্ষের সাড়ার কথা বলেন নি বা সাড়া পরিমাপ করবার জন্য কোন যন্ত্রও আবিষ্কার করেন নি। পত্রের শেষে বিশ্ব-বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জগদীশচন্দ্রকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করলেন যে, জগদীশচন্দ্র যেন তাঁর পরীক্ষাগারে বিদেশী ছাত্রদের গবেষণা করবার সুযোগ দেন। কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে জীববিজ্ঞানের আর এক প্রখ্যাত অধ্যাপক জগদীশচন্দ্রকে তাঁর আবিষ্কৃত "রেজোন্যান্ট রেকর্ডার" নামক যন্ত্রটি বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিজ্ঞান শাখায় দেবার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ করলেন। প্রসঙ্গক্রমে অধ্যাপক মারকোয়েট জগদীশচন্দ্রকে জানালেন যে, তাঁর আবিষ্কৃত যন্ত্রটি শারীরবিজ্ঞানে এক যুগান্তর আনবে।

প্রত্যেক বছর আমেরিকায় বিজ্ঞানীদের এক সম্মেলন হয়। সেই সম্মেলনে বিজ্ঞানের সব শাখার প্রথিতযশা বিজ্ঞানিগণ বছরের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সম্বন্ধে আলোচনা করেন এবং ওই আবিষ্কার সম্পর্কে আপন আপন অভিমত প্রকাশ করেন। ১৯১৪ খ্রীস্টাব্দে আমেরিকার পেনিসলভ্যানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ওইরকম বিজ্ঞান-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ওই সম্মেলনে জগদীশচন্দ্র তাঁর আবিষ্কার সম্বন্ধে বক্তৃতা করবার জন্য আমন্ত্রিত হলেন।

সময়টা ছিল ডিসেম্বর মাস। আমেরিকায় তখন প্রচণ্ড শীত। তাপমাত্রা এত কম যে নদীর জল পর্যন্ত জমে বরফে পরিণত হয়েছে। জগদীশচন্দ্র যেসব উদ্ভিদ সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন তাদের বাঁচিয়ে রাখাটা একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন "হট হাউস"-এর তাপমাত্রা সর্বাধিক বাড়িয়ে তার মধ্যে গাছগুলিকে রেখে দেওয়া হল। তাতেও তেমন আশাপ্রদ কাজ না হওয়াতে ওই "হট হাউস"-এ কয়েকটা ইলেক্‌ট্রিক চুল্লী জ্বেলে দেওয়া হল। এইভাবে প্রচণ্ড শীতের হাত থেকে গাছগুলিকে বাঁচিয়ে রাখা হল। অনেকে কৌতূহল নিবৃত্ত করতে "হট হাউস"-এ এলেন। জগদীশচন্দ্রের গাছগুলিকে দেখে তাঁদের কৌতূহল আরও বেড়ে গেল।

অবশেষে সেই নির্দিষ্ট দিনটি এল। জগদীশচন্দ্র সভাগৃহে প্রবেশ করে দেখলেন তাঁর আবিষ্কার প্রত্যক্ষ করবার জন্য বিজ্ঞানী মহল উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছেন। তাঁদের সামনে নিজের উদ্ভাবিত যন্ত্রপাতি নিয়ে জগদীশচন্দ্র তাঁর আবিষ্কৃত তথ্যকে যুক্তি এবং পরীক্ষা দ্বারা সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীর সামনে প্রতিষ্ঠিত করলেন। তাঁর বক্তৃতা শুনে এবং সেই বক্তৃতার স্বপক্ষে পরীক্ষিত প্রমাণ চাক্ষুষ করে উপস্থিত সকলে বিস্মিত হয়ে গেলেন। সকলে নির্দ্বিধায় স্বীকার করলেন ওই বছর জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কারই সর্বশ্রেষ্ঠ। আমেরিকার তৎকালীন পত্র-পত্রিকাগুলো ফলাও করে জগদীশচন্দ্রের বক্তৃতা এবং আবিষ্কারের কাহিনী তাঁদের পত্রিকায় প্রকাশ করলেন।

আমেরিকার পূর্ব উপকূলে অবস্থিত নিউইয়র্ক, ফিলাডেলফিয়া এবং বোস্টন। ফিলাডেফিয়া শহরে আমেরিকার প্রাচীন ঐতিহ্যমণ্ডিত "ফিলসফিক্যাল সোসাইটি অফ আমেরিকা" নামে একটি প্রতিষ্ঠান অবস্থিত। বিখ্যাত বিজ্ঞানী বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন ওই প্রতিষ্ঠানটির প্রতিষ্ঠাতা। ওই প্রতিষ্ঠানের তৎকালীন সভাপতি ডব্লিউ কীন বিশ্বে শ্রেষ্ঠ মস্তিষ্কের শল্য-চিকিৎসক হিসাবে পরিচিত ছিলেন। তিনি জগদীশচন্দ্রকে তাঁর প্রতিষ্ঠানে বক্তৃতা দেবার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন।

জগদীশচন্দ্র সানন্দে তাঁর আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। এখানেও জগদীশচন্দ্রের বক্তৃতা অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করল। ওই প্রতিষ্ঠানে জগদীশচন্দ্রের বক্তৃতা শুনবার জন্য যাঁরা যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে বেশীর ভাগই ছিলেন শল্য-চিকিৎসক এবং উদ্ভিদবিজ্ঞানী। তাঁদের সামনে জগদীশচন্দ্র যখন একটি উদ্ভিদের ওপর ক্লোরোফর্ম প্রয়োগ করে ওই উদ্ভিদদেহের স্নায়ুর প্রতিক্রিয়া যন্ত্রেতে পরিমাপ করে দেখালেন তখন উপস্থিত বিজ্ঞানিগণ আশ্চর্য হয়ে গেলেন। ওই বক্তৃতার পরদিনও ফিলাডেলফিয়ার প্রভাতী সংবাদপত্রগুলিতে জগদীশচন্দ্রের বক্তৃতা এবং পরীক্ষার বিবরণ ছাপা হল। অনেক পত্রিকার সম্পাদকীয় স্তম্ভে জগদীশচন্দ্রের উচ্চ প্রশংসা করা হল।

ফিলাডেলফিয়ার সাফল্যের পর জগদীশচন্দ্র আহূত হলেন নিউইয়র্কের একাডেমি অফ সায়েন্স থেকে। ওই বক্তৃতায় অনেক শ্রোতা হবে এ কথা আগের থেকে অনুমান করা গিয়েছিল। কারণ ইতিমধ্যেই জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কারের কাহিনী নিউইয়র্কের জনসাধারণ জেনে গেছেন। নিউইয়র্কের ন্যাশনাল হিস্ট্রি মিউজিয়মটিতে প্রচুর দর্শকের বসার ব্যবস্থা ছিল। অনেক দর্শক সমাগম হতে পারে ভেবেই ব্যবস্থাপকগণ ওই বিশাল হলঘরেই জগদীশচন্দ্রের বক্তৃতার ব্যবস্থা করলেন। সকলকে জানাবার জন্য যে বুলেটিন প্রকাশ করা হল অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্স প্রতিষ্ঠান থেকে তার মর্মার্থ মোটামুটি এই রকম—"এই অ্যাকাডেমিতে অধ্যাপক বসু উদ্ভিদের অব্যক্ত জীবনের গোপন রহস্য তাঁর আবিষ্কৃত যন্ত্রের সাহায্যে উদ্ঘাটিত করবেন। বৃক্ষ নিজেই তার পীড়ন ও বেদনা জানাবে এবং উদ্ভিদের এই অনুভূতি অধ্যাপক বসু কর্তৃক উদ্ভাবিত যন্ত্রে ধরা পড়বে। প্রাণী-জগতে যেমন ঘটে উদ্ভিদজগতেও তেমনি আনন্দ, আঘাত এবং অবসাদের অনুভূতি দেখা দেয়। এখানে অধ্যাপক বসু যেসব পরীক্ষা দেখাবেন তাদের মধ্যে থাকবে বিষপ্রয়োগে উদ্ভিদদেহের প্রতিক্রিয়া, উত্তেজক ওষুধের প্রয়োগে উদ্ভিদদেহের উত্তেজনার অনুভূতি প্রদর্শন

ইত্যাদি। অধ্যাপক বসু তাঁর আবিষ্কৃত যন্ত্রে উদ্ভিদের হৃদ্‌স্পন্দনও রেকর্ড করে দেখাবেন। এই সব গবেষণা কৃষি, শারীরবিদ্যা এবং ভেষজ বিদ্যায় নতুন করে আলোকপাত করবে।"

সায়েন্স সোসাইটির সভায় জগদীশচন্দ্র যে বক্তব্য রাখলেন তা শুনে উপস্থিত বিজ্ঞানিগণ ওপরে উল্লিখিত বুলেটিনের সত্যতা স্বচক্ষে এবং স্বকর্ণে যাচাই করলেন। ওই বক্তৃতার পর "নিউইয়র্ক অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সের" সভাপতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে জগদীশচন্দ্রকে একটি চিঠি লেখেন। তাতে তিনি বলেন যে, জগদীশচন্দ্র তাঁর নিজের উদ্ভাবিত যন্ত্রের সাহায্যে উদ্ভিদের ওপর বিভিন্ন ওষুধের প্রক্রিয়া এবং উদ্ভিদের দেহে আঘাতের অনুভূতি যেভাবে প্রমাণ করেছেন প্রত্যেক শ্রোতা তার নতুনত্বে মুগ্ধ হয়েছে। ওই সভাপতি জগদীশচন্দ্রকে আরও জানালেন যে, জগদীশচন্দ্রের বক্তৃতার শেষে শ্রোতৃমণ্ডলী সভাগৃহ ছেড়ে যেতে দ্বিধান্বিত ছিল। অ্যাকাডেমিতে এর আগে বিজ্ঞান বিষয়ে মৌলিক আবিষ্কার সংক্রান্ত যত বক্তৃতা হয়েছে তার মধ্যে জগদীশচন্দ্রের বক্তৃতা ছিল সব থেকে চমকপ্রদ। সব শেষে তিনি জগদীশচন্দ্রকে লিখলেন যে, বৃটিশ সরকার জগদীশচন্দ্রকে আমেরিকায় বক্তৃতা দেবার জন্য অনুমতি দিয়ে বিশেষ বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন।

"সায়েন্টিফিক্ আমেরিকান" পত্রিকার সম্পাদকও জগদীশচন্দ্রের বক্তৃতা শুনতে এসেছিলেন। তিনিও জগদীশচন্দ্রের বক্তৃতা শুনে মুগ্ধ হয়েছিলেন। "সায়েন্টিফিক্ আমেরিকান" পত্রিকায় তিনি তাঁর মনের কথা অকপটে স্বীকার করে একটি সচিত্র প্রবন্ধ লেখেন। তাতে তিনি তাঁর পত্রিকার পাঠকদের জানালেন যে কল্পনা ও ধারণাশক্তির অতীত সূক্ষ্ম যন্ত্রের সাহায্যে ভারতীয় বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করেছেন যে উদ্ভিদেরও অনুভূতি আছে। প্রাণিদেহে আঘাত করলে যেমন তার শরীরে প্রতিক্রিয়া হয়, একটা উদ্ভিদের দেহে আঘাত করলেও তার দেহে অনুরূপ প্রতিক্রিয়া হয়। অবসাদক দ্রব্য প্রয়োগের ফলে

উদ্ভিদও অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে। ক্লোরোফর্ম প্রয়োগে প্রাণীদের মত উদ্ভিদও জ্ঞান হারিয়ে ফেলে, ক্লান্ত হলে শান্তির চিহ্ন প্রকাশ করে এবং আলস্যে রুগ্ন হয়। ভেষজ ওষধি এবং কৃষিবিজ্ঞানে এর ফল হবে সুদূরপ্রসারী।

বোস্টনে জগদীশচন্দ্র

"টুয়েন্টিথ্ সেন্সুরি ক্লাব" ছিল আমেরিকার সংস্কৃতির একটি নাম-করা প্রতিষ্ঠান। ওই প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দের নববর্ষে (১লা জানুয়ারী) জগদীশচন্দ্রকে আমন্ত্রণ জানালেন তাঁদের প্রতিষ্ঠানে বক্তৃতা করবার জন্য। জগদীশচন্দ্রের সেই সভায় বোস্টন শহরের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানিগণ যোগদান করেছিলেন। ওই সভায় জগদীশচন্দ্রের ভাষণের শিরোনাম ছিল "ম্যাটার অ্যাণ্ড থট"। বোস্টন শহর বহু নামকরা বিজ্ঞানীর জন্মভূমি। ইংলণ্ডের "রয়াল ইনস্টিটিউশনের" প্রতিষ্ঠাতা কাউন্ট রামফোর্ড এই বোস্টন শহরেরই অধিবাসী ছিলেন। বিদ্যুৎ বিষয়ে আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ মর্স এবং বিশ্বখ্যাত বৈজ্ঞানিক লুইস আগাসিজ ছিলেন বোস্টন শহরেরই লোক। এই বোস্টন শহরেই বিজ্ঞানী বেল মানুষের কণ্ঠস্বর তারের মধ্য দিয়ে পাঠাতে সমর্থ হন। এই বোস্টন শহরেই প্রথম প্রমাণিত হয় যে ঈথর প্রাণিদেহের জ্ঞান লোপ করতে পারে। ১৯০৭ সালে যেমন এবারও তেমনি বোস্টন শহরে জগদীশচন্দ্র বোস্টন শহরের খ্যাতিমান লোকদের সঙ্গে পরিচিত হন। জ্যোতির্বিজ্ঞানী অধ্যাপক লাউয়েন মার্স উপগ্রহে প্রাণীর অস্তিত্ব আবিষ্কার করবার জন্য জীবনব্যাপী সাধনা করেছেন। তাঁর সঙ্গে জগদীশচন্দ্র নিজের এবং তাঁর গবেষণা সম্বন্ধে অন্তরঙ্গ আলোচনা করেন। মার্গারেট ডিল্যাণ্ড ছিলেন বোস্টনের সমসাময়িক সাহিত্যিকদের মধ্যে সব থেকে খ্যাতিমান সাহিত্যিক। সেই মার্গারেট ডিল্যাণ্ড জগদীশচন্দ্রকে এক অভ্যর্থনা সভায় আমন্ত্রণ জানান।

পরবর্তী যাত্রা ওয়াশিংটনে

বোস্টন শহরে থাকতে থাকতেই জগদীশচন্দ্র ওয়াশিংটন থেকে আমন্ত্রণ পেলেন। ওয়াশিংটনের "একাডেমি অফ সায়েন্স", "বটানিকাল সোসাইটি অফ আমেরিকা", এবং "ব্যুরো অফ প্ল্যাণ্ট ইণ্ডাস্ট্রি"—এই তিনটি বিখ্যাত সংস্থা একযোগে একটি সভার আয়োজন করলেন। "ব্যুরো অফ প্ল্যাণ্ট ইণ্ডাস্ট্রি" ছিল একটি সরকারী প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানে সহস্রাধিক কৃষিবিজ্ঞানী গবেষণা কার্যে লিপ্ত ছিলেন। তাঁদের গবেষণার মূল উদ্দেশ্য ছিল উদ্ভিদজীবন সম্বন্ধে গবেষণা করে সেই গবেষণালব্ধ ফল কৃষির উন্নতিতে প্রয়োগ করা। এই প্রতিষ্ঠানের দু'জন কৃষিবিজ্ঞানীর সঙ্গে জগদীশচন্দ্রের পরিচয় হল যাঁরা বাংলাদেশ এবং উত্তরপ্রদেশ থেকে ফজলি এবং অন্যান্য জাতের আম নিয়ে দীর্ঘদিন গবেষণাকার্যে লিপ্ত ছিলেন।

তিন সংস্থা কর্তৃক ওয়াশিংটনে আয়োজিত সভায় প্রচুর জ্ঞানী-গুণীর সমাবেশ হয়েছিল। সভাগৃহে যাঁরা জায়গা করে নিতে পারেন নি তাঁরা বাইরে বার হবার দরজার পাশে দাঁড়িয়ে রইলেন জগদীশচন্দ্রের বক্তৃতা শুনবার জন্য। টেলিফোনের আবিষ্কর্তা গ্রাহাম বেল এলেন বক্তৃতা আরম্ভ হওয়ার পনের মিনিট আগে। তার আগেই সভাগৃহ কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে গেছে। তাই গ্রাহাম বেল সভাগৃহের ভেতরে প্রবেশ করতে পারলেন না। অত্যধিক শীতে উদ্ভিদের যাতে কোন ক্ষতি না হয় তারজন্য সভাগৃহ কৃত্রিম উপায়ে উত্তপ্ত রাখার ব্যবস্থা ছিল। ফলে স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে যাঁরা সভায় উপস্থিত ছিলেন তাঁরা কিছুটা অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। সভার উদ্যোক্তাদের তরফ থেকে সভাগৃহ উত্তপ্ত রাখার কারণ শ্রোতৃমণ্ডলীকে জানিয়ে দেওয়া হল এবং সবিনয়ে অনুরোধ করা হল যাঁরা অস্বস্তি বোধ করছেন তাঁরা সভাগৃহ পরিত্যাগ করতে পারেন। দেখা গেল সমবেত শ্রোতাদের মধ্যে কেউই সভাগৃহ পরিত্যাগ করছেন না। বরং যাঁরা দরজায় দাঁড়িয়ে ছিল তাঁরা ঠেলাঠেলি করে ভেতরে ঢুকতে চাইছেন।

না পেরে কেউ কেউ দরজাতেই চেপে বসে পড়লেন। কেউ বা জানালার কার্নিশ বেয়ে উঠলেন। ওই অনুষ্ঠানে জগদীশচন্দ্র যখন বক্তৃতা শেষ করলেন তখন দেখা গেল একজন শ্রোতাও সভাগৃহ পরিত্যাগ করছেন না। তাঁরা মুগ্ধ হয়ে গেছেন জগদীশচন্দ্রের বক্তৃতা শুনে এবং পরীক্ষা চাক্ষুষ দেখে। তাঁদের সনির্বন্ধ অনুরোধে জগদীশচন্দ্র আরও আধঘণ্টা বক্তৃতা দিলেন উদ্ভিদজীবনের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে।

স্মিথ্‌সোনিয়ান ইনস্টিটিউশনে

জেমস স্মিথ্‌সোনিয়ান ছিলেন ওয়াশিংটনের একজন নামকরা বিজ্ঞানী। তাঁর ঐকান্তিক চেষ্টায় একটি বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। সেই প্রতিষ্ঠানেরই নাম ছিল "স্মিথ্‌সোনিয়ান ইনস্টিটিউশন"। ওয়াশিংটন অধিবাসীদের কাছেও প্রতিষ্ঠানটি ছিল অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ। কারণ ওই প্রতিষ্ঠানের সভ্যদের মধ্যে ছিলেন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট, ভাইস্ প্রেসিডেন্ট এবং প্রধান বিচারপতি। এ ছাড়া তিন জন সেনেটার ও ওই প্রতিষ্ঠানের সভ্য। "স্মিথ্‌সোনিয়ান ইনস্টিটিউশনের" কর্মকর্তাদের অনুরোধ উপেক্ষা না করতে পেরে জগদীশচন্দ্র এখানেও বক্তৃতা দিলেন। অন্যান্য জায়গার মত এখানকার বক্তৃতাও সাফল্য লাভ করল।

ইতিমধ্যে গ্রাহাম বেল তাঁর উদ্ভাবিত টেলিফোনের মাধ্যমে বহুদূরবর্তী অঞ্চলের মানুষের সঙ্গে কথা বলে বিজ্ঞানের জগতে এক যুগান্তর এনেছেন। ইতিপূর্বে ওয়াশিংটনের "একাডেমি অফ সায়েন্সে" জগদীশচন্দ্র যখন বক্তৃতা করেছিলেন তখন বেল তা শুনতে পান নি। তাই তাঁর একটা আক্ষেপ থেকে গিয়েছিল। বেল এবার নিজের বাড়ীতে জগদীশচন্দ্রকে অভ্যর্থনা করবার আয়োজন করলেন। সেই অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ করা হল ওয়াশিংটনের শ্রেষ্ঠ রাজনীতিক এবং বিজ্ঞানীদের। আমন্ত্রিত ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন কার্টিস যিনি

আকাশযানে প্রথম অ্যাটলান্টিক মহাসাগর অতিক্রম করবার চেষ্টা করছেন। আর ছিলেন আমেরিকার তৎকালীন সেক্রেটারী অফ স্টেট মিঃ লামসিং। ওয়াশিংটনে জগদীশচন্দ্রের বক্তৃতা এতটা সাফল্য লাভ করেছিল যে আমেরিকার স্টেট ডিপার্টমেণ্টের সম্পাদক মিঃ ব্রায়ান স্টেট ডিপার্টমেণ্টের বিভিন্ন শাখার বিভাগীয় প্রধানদের সামনে জগদীশচন্দ্রের একটি বক্তৃতার ব্যবস্থা করেছিলেন। কূটনৈতিক ব্যক্তিদের অভ্যর্থনা করবার জন্য নির্দিষ্ট ঘরে জগদীশচন্দ্রের বক্তৃতার ব্যবস্থা হল। বক্তৃতা শুনবার জন্য উপস্থিত অনেক জ্ঞানী-গুণীর মধ্যে ছিলেন কয়েকটি প্রখ্যাত পত্রিকার সাংবাদিক। যেদিন জগদীশচন্দ্র বক্তৃতা দিলেন তার পরদিন ওয়াশিংটনের প্রভাতী সংবাদপত্রে জগদীশচন্দ্রের বক্তৃতার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ প্রকাশিত হল। তাদের বিবরণের মূল বিষয়বস্তু ছিল এই যে ভারতীয় বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র হাতেকলমে প্রমাণ করে দেখিয়ে দিয়েছেন যে প্রাণী-দেহের মত উদ্ভিদেরও অনুভূতি আছে। বিষপ্রয়োগে উদ্ভিদের মৃত্যু হয়, ক্লোরোফর্ম প্রয়োগে উদ্ভিদ জ্ঞান হারায়, উত্তেজক ওষুধ প্রয়োগে উত্তেজিত হয় আবার অবসাদক বস্তু প্রয়োগে অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে। সংবাদপত্রগুলি আরও লিখলেন যে, একটি জটিল যন্ত্র দ্বারা ডঃ জগদীশচন্দ্র বসু বৃক্ষের হৃদয়াবেগ রেকর্ড করালেন। কোন ব্যক্তির শরীরের কোন জায়গায় আঘাত করলে তার আবেগ তৎক্ষণাৎ তার মস্তিষ্কে পৌঁছায়। ওই ব্যক্তি তখন ব্যথা অনুভব করে। তেমনি উদ্ভিদ-অঙ্গের কোথায়ও আঘাত করলে উদ্ভিদ আঘাতে কষ্ট পায় এবং একরকম অনুভূতি অনুভব করে। প্রমাণস্বরূপ ডঃ বসু একটি উদ্ভিদের দেহে চিমটি কাটলেন। সঙ্গে সঙ্গে ওই উদ্ভিদের সঙ্গে যুক্ত একটা লিভারে আঁটা একটা ছুঁচালো বস্তু উত্তেজিত হল এবং ভূষো মাখান একটি আয়নায় দাগ কেটে মনের আবেগ প্রকাশ করতে লাগল। ডঃ বসু পটাসিয়াম সায়ানাইড প্রয়োগে একটা উদ্ভিদের মৃত্যু ঘটালেন। উপস্থিত সকলে রুদ্ধশ্বাসে সেই উদ্ভিদের মৃত্যুযন্ত্রণা প্রত্যক্ষ করতে লাগলেন।

চিকাগোয়

ওয়াশিংটনের পর জগদীশচন্দ্রের বক্তৃতার স্থান নির্দিষ্ট হল আমেরিকার চিকাগো শহরে। চিকাগো শহরে কোন্ বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান জগদীশচন্দ্রের বক্তৃতার ব্যবস্থা করবেন তা নিয়ে মৃদু বিতর্কের উদ্ভব হল। অবশেষে স্থির হল যে চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের সব বিজ্ঞানীদের নিয়ে একটি কমিটি গঠিত হবে। তাঁরাই জগদীশচন্দ্রের বক্তৃতার ব্যবস্থা করবে। সেই সভায় সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক মিলিকান নামে এক বিজ্ঞানী। তিনি শ্রোতাদের সঙ্গে জগদীশচন্দ্রকে পরিচয় করাতে গিয়ে বললেন যে ১৯০০ খ্রীস্টাব্দে প্যারিসের বিজ্ঞান কংগ্রেসে তিনি জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে প্রথম পরিচিত হন। আজ সেই জগদীশচন্দ্রকে তিনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী হিসেবে সহকর্মীদের সঙ্গে পরিচয় করাতে গর্ব অনুভব করছেন। অধ্যাপক মিলিকান আরও বলেন যে, এ যাবৎকাল যাঁরা জগদীশচন্দ্রকে কেবল একজন প্রাণীবিদ্ বলেই জানতেন তাঁদের মনে রাখা উচিত জগদীশচন্দ্র মূলত একজন পদার্থবিজ্ঞানী। সুতরাং নিজের চিরাচরিত বিচরণক্ষেত্র অতিক্রম করে আর একটি জ্ঞান রাজ্যে সাবলীলভাবে বিচরণ করছেন এবং সেই রাজ্যে একচ্ছত্র অধিপতি হয়ে গেছেন।

কালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে

যে কোন প্রতিষ্ঠানেই বক্তৃতা করতে জগদীশচন্দ্রের শারীরিক পরিশ্রম হত প্রচণ্ড। তা ছাড়া মানসিক চাপ তো থাকতই। এক বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা শেষ করে যখন তিনি অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা করতেন তখন পথেও তাঁকে অনেক শারীরিক শ্রম স্বীকার করতে হত। কখনও গন্তব্যস্থানে পৌঁছতে জগদীশচন্দ্রকে কয়েক হাজার মাইল পথ রেলগাড়ীতে অতিক্রম করতে হত। সঙ্গে থাকত সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি এবং অনেক গাছগালা। সেগুলোকে ঠিকমত রক্ষা করা এবং গন্তব্যস্থানে অক্ষত অবস্থায় নিয়ে যাওয়ার চিন্তাটা

জগদীশচন্দ্রের মনে বাসা বেঁধে থাকত। ভারতীয় আবহাওয়ায় আজন্ম লালিত জগদীশচন্দ্র পশ্চিমের অত্যধিক শীতের আবহাওয়ায় মাঝে মাঝে অস্বস্তি বোধ করতেন। বেশীর ভাগ ট্রেনই ছিল শীততাপ নিয়ন্ত্রিত। ট্রেন থেকে কোন স্টেশনে নামলেই তিনি অত্যধিক শীত অনুভব করতেন। তা ছাড়া গন্তব্য স্থানে পৌঁছানোর কিছুক্ষণের মধ্যেই পরীক্ষা দেখাবার ব্যবস্থা করতে হত। সেখানে হয়তো পরীক্ষা দেখাবার জন্য অনুকূল পরিবেশই থাকত না।

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা শেষ করে জগদীশচন্দ্র স্থির করলেন জাপানে যাবেন। ইতিমধ্যে কালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ জগদীশচন্দ্রকে আমন্ত্রণ জানালেন বক্তৃতা করবার জন্যে। জগদীশচন্দ্র সেই আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। সেখানে যেতে হলে প্রায় তিন হাজার মাইল পথ অতিক্রম করতে হবে। সময় লাগবে চার দিন চার রাত্রি। কালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবার উদ্দেশ্যে জগদীশচন্দ্র যেখান থেকে যাত্রা শুরু করলেন সেখানে ছিল প্রচণ্ড শৈত্যপ্রবাহ। সারা দেশ তুষারাচ্ছন্ন ; প্রশান্ত মহাসাগরের কাছাকাছি এসে প্রকৃতি জগদীশচন্দ্রের প্রতি সদয় হল। শীতের প্রাবল্য ক্রমশ কমে আসতে লাগল। কালিফোর্নিয়ার প্রাকৃতিক পরিবেশ অনেকটা ভারতবর্ষের মত। বেশীর ভাগ ভূমি সমতল এবং সবুজ বনাচ্ছাদিত। অবশেষে ১২ই মার্চ জগদীশচন্দ্র কালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে পৌঁছলেন। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মত এখানেও জগদীশচন্দ্র তার বক্তব্য এবং পরীক্ষা দ্বারা বিজ্ঞানী মহলের ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করলেন। এর পর জগদীশচন্দ্রের কাছে আমন্ত্রণ এল লেলাণ্ড স্টানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। এই স্টানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় গঠনের পেছনে এক মর্মান্তিক ইতিহাস আছে। লেলাণ্ড স্টানফোর্ড ছিলেন আমেরিকার সেনেটের একজন সভ্য। একদিন স্ট্যানফোর্ড সেনেটের সভায় যোগদান করতে গেছেন। এমন সময় তাঁর কাছে একমাত্র পুত্রের মৃত্যুর মর্মান্তিক সংবাদ এসে পৌঁছল। সেনেটের সভাতেই স্টানফোর্ড তাঁর একটি সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা

করলেন। বললেন যে, কালিফোর্নিয়াতেই তিনি তার প্রাণাধিক পুত্রের স্মৃতিস্থান গড়ে তুলবেন। যেই কথা সেই কাজ। স্টানফোর্ড এই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উদ্দেশ্যে তাঁর যথাসর্বস্ব দিয়েছিলেন। পুত্রহারা জননী তাঁর সমস্ত মূল্যবান অলঙ্কার দিয়েছিলেন। এইভাবেই গড়ে উঠল লেলাণ্ড স্টানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা লেলাণ্ড স্টানফোর্ড এবং তাঁর সুযোগ্য সহধর্মিণী একটা শর্ত আরোপ করলেন। তা হল যে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠনের জন্য কোন ছাত্রের কাছ থেকে বেতন নেওয়া চলবে না। এইভাবেই বুঝি পুত্রহারা জননী শতছাত্রের মধ্যে নিজের পুত্রকে ফিরে পেতে চেয়েছিলেন। লেলাণ্ড স্টানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে জগজীশচন্দ্র বক্তৃতা দিলেন। অন্যান্য সভার মত এই সভার সমবেত বিজ্ঞানীরাও জগদীশচন্দ্রের বক্তৃতা শুনে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। সভার শেষে উদ্ভিদবিদ্যার অধ্যাপক ডাঃ জে. পিয়ার্স একটি চিঠি দিলেন। এই চিঠির বিষয়বস্তু থেকেই বোঝা যাবে স্টানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে জগদীশচন্দ্রের বক্তৃতা বিজ্ঞানী মহলকে কতটা বিস্মিত করেছিল। ডাঃ জে. পিয়ার্সের 'জগদীশচন্দ্রকে লেখা চিঠিটির বঙ্গানুবাদ করলে এই দাঁড়ায় যে জগদীশচন্দ্র সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীকে উদ্ভিদজীবন সম্বন্ধে যে, তথ্য পরিবেশন করেছেন এবং যন্ত্রপাতি সহযোগে প্রমাণ করেছেন তা অবিস্মরণীয়। একজন শিক্ষকের পক্ষে এর থেকে বড় পুরস্কার আর কি হতে পারে! আর জগদীশচন্দ্রের গবেষণার ফলে বিজ্ঞানীরা এক নতুন জগতের সন্ধান পেয়েছেন। একজন গবেষকের পক্ষে এর চাইতে বড় সম্মান আর কি হতে পারে? জগদীশচন্দ্র তাঁর আবিষ্কার দ্বারা মানুষের অশেষ মঙ্গল করেছেন।

পরবর্তী জয়যাত্রা জাপানে

লেলাণ্ড স্টানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জগদীশচন্দ্রের আমেরিকা ভ্রমণও শেষ হল। তিনি ঠিক করলেন

জাপান হয়ে স্বদেশে ফিরবেন। জাপান ব্যবসা ক্ষেত্রে বিশ্বে শ্রেষ্ঠ ব্যবসায়ী জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে জাপান প্রশান্ত মহাসাগর এলাকায় জাহাজের ফলাও ব্যবসা করত। প্রকৃতপক্ষে ওই এলাকায় জাহাজের ব্যবসায়ে জাপান ছিল অপ্রতিদ্বন্দ্বী। জাহাজে যেসব যাত্রি আরোহণ করত তাদের প্রতি জাহাজ কর্তৃপক্ষের অমায়িক ব্যবহার যাত্রীদের বেশী করে আকৃষ্ট করত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জাপান যোগ দেয় নি। তাই জগদীশচন্দ্র স্থির করলেন জাপান হয়েই দেশে ফিরবেন।

১৯১৫ খ্রীস্টাব্দের ২০শে মার্চ জগদীশচন্দ্র "নিপন্ন মারু" নামে এক জাপানী জাহাজে চেপে সানফ্রান্সিসকো থেকে যাত্রা করলেন জাপানের উদ্দেশ্যে। ২৬শে মার্চ তিনি সদলবলে হনলুলুতে এসে পৌঁছলেন। হনলুলু প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের একটি দ্বীপ। আমেরিকা এই দ্বীপটিকে একটি দুর্ভেদ্য সামরিক ঘাঁটিতে পরিণত করেছিল। এখানেই জগদীশচন্দ্র প্রথম সাবমেরিনের সাক্ষাৎ পেলেন। জগদীশচন্দ্র যেদিন হনলুলুতে এসে পৌঁছলেন সেদিন একটি দুর্ঘটনা ঘটেছিল। সামরিক মহড়া দেবার জন্য একটা সাবমেরিন জলের মধ্যে ডুব দেওয়ার পর আর উঠল না। তখন অনুমান করা হল সাবমেরিনটি নিশ্চয়ই কোন বড় দুর্ঘটনায় পড়েছে। সাবমেরিনটিকে খুঁজে বার করবার জন্য সমুদ্রতলায় অনেক অনুসন্ধান চালান হল। কিন্তু কোন লাভ হল না। হনলুলুতে জাহাজ পৌঁছাবার আগেই জগদীশচন্দ্র হনলুলুর আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে এক আমন্ত্রণ পত্র পেলেন সেখানে বক্তৃতা করবার জন্য। কিন্তু জাহাজ যেদিন হনলুলুতে পৌঁছাল সেই দিনই সন্ধ্যায় জাহাজ ছেড়ে দিল। ফলে এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে জগদীশচন্দ্রের আর বক্তৃতা দেওয়া হল না।

জাহাজের পরবর্তী গন্তব্য স্থান ইয়োকোহামা। কিছুদিন আগে থেকেই জগদীশচন্দ্রের শরীর ভাল যাচ্ছিল না। সকলে ভেবেছিলেন

সমুদ্র ভ্রমণে জগদীশচন্দ্রের স্বাস্থ্যোদ্ধার হবে। কিন্তু তা হল না। বরং স্বাস্থ্য আরও খারাপের দিকে যেতে লাগল। জগদীশচন্দ্রের সহকর্মীরা চিন্তান্বিত হয়ে উঠলেন। জগদীশচন্দ্র যে জাহাজে ভ্রমণ করছিলেন তার ডাক্তারকে ডেকে পাঠান হল। ডাক্তার পরীক্ষা করে বললেন, সমুদ্র ভ্রমণের জন্যই জগদীশচন্দ্রের স্বাস্থ্য খারাপের দিকে যাচ্ছে। অবশেষে ৭ই এপ্রিল জাহাজ ইয়োকোহামা বন্দরে এসে ভিড়ল। ইতিমধ্যে জগদীশচন্দ্রের স্বাস্থ্যের আরও অবনতি হয়েছে।

কিছুদিন আগে জগদীশচন্দ্র যখন হার্ভার্ডে ছিলেন তখনই তাঁর জ্বর হয়েছিল। তখন ওষুধ দিয়ে সেই জ্বর বন্ধ করা হয়েছিল। সকলে ভাবলেন সেই ওষুধের প্রতিক্রিয়াই হয়ত জগদীশচন্দ্রের স্বাস্থ্যের ক্ষতি করছে। জাপানে অনেক ভারতীয়, আমেরিকান এবং জাপানী অধিবাসী জগদীশচন্দ্রকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন। সিদ্ধান্ত হল জাপ-সম্রাটের ডাক্তারকে দিয়ে জগদীশচন্দ্রের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হবে। সম্রাটের ডাক্তার দেখে বললেন যে, জগদীশচন্দ্র এক কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়েছেন যে রোগ নিরাময় কোন ওষুধের দ্বারা সম্ভব নয়। টোকিওর আন্তর্জাতিক হাসপাতালের ডিরেক্টর বিখ্যাত আমেরিকান ডাক্তার টেনস্লারে জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার বিষয়ে ওয়াকিবহাল ছিলেন। মনে মনে তিনি জগদীশচন্দ্রকে গভীর ভাবে শ্রদ্ধা করতেন। সেই ডাক্তার বললেন, তিনি জগদীশচন্দ্রের জন্য কিছু করতে পারলে নিজেকে সৌভাগ্যবান ভাববেন। ডাঃ টেনস্লারে অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে জগদীশচন্দ্রের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে বললেন যে, শারীরিক পরিশ্রম এবং অত্যধিক মানসিক চাপের ফলে জগদীশচন্দ্রের স্বাস্থ্যের ওই দশা হয়েছে। জগদীশচন্দ্রের খাদ্য, ওষুধ, বিশ্রাম ইত্যাদির ব্যাপারে একটা রুটিন করে দিলেন। জাপানের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানে জগদীশচন্দ্রের যে বক্তৃতা দেওয়ার কথা ছিল তা বন্ধ করে দেওয়া হল। ডাঃ বলে দিলেন জগদীশচন্দ্রের স্বাস্থ্য স্বাভাবিক হলে

মাত্র দু'টি সংস্থায় তিনি বক্তৃতা করতে পারবেন। জাপানের কামাকুরা নামে সমুদ্র উপকূলে এক স্বাস্থ্যনিবাস ছিল। ডাক্তারের চেষ্টায় জগদীশচন্দ্রের জন্য ওই স্বাস্থ্যনিবাস নির্দিষ্ট হল। প্রকৃতপক্ষে ডাঃ জগদীশচন্দ্রের মঙ্গল কামনায় সমুদ্রোপকূলে তাঁর নির্জনবাসের ব্যবস্থা করে দিলেন যাতে বাইরের পৃথিবীর ঝঞ্ঝাট তাঁর শরীর ও মনকে পীড়িত না করতে পারে। সেই স্বাস্থ্যনিবাসে বসে বসে জগদীশচন্দ্র মনপ্রাণ দিয়ে মহাসমুদ্রের গর্জন শুনেছেন আর দিগন্তবিস্তৃত ঘন নীল আকাশের দিকে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থেকেছেন। হোটেলের ম্যানেজার জগদীশচন্দ্রের সেবাযত্নের কোনরকম ত্রুটি হতে দিলেন না। জগদীশচন্দ্র নিশ্চিন্ত নির্বিঘ্নে তিন সপ্তাহ স্বাস্থ্যনিবাসে কাটালেন। তিনি নিষ্পাপ সবল শিশুর মত সমুদ্রোপকূলে বেড়াতেন। বালুকাবেলায় শামুক ও ঝিনুক সংগ্রহ ছিল নিত্যদিনের অভ্যাস।

স্বাস্থ্যনিবাসে তিন সপ্তাহ থাকার পর জগদীশচন্দ্রের স্বাস্থ্য অনেকটা ভাল হয়ে গেল। তিনি অনুভব করলেন এবার তিনি তাঁর কর্মজগতে ফিরে যেতে পারেন। ইতিপূর্বেই জাপানের ওয়াসেডা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমন্ত্রণ এসেছে ওখানে বক্তৃতা করবার সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়ে। জগদীশচন্দ্র স্থির করলেন এইবার তিনি সেই অনুরোধ রক্ষা করবেন।

১৯১৫ খ্রীস্টাব্দের ১লা মে। ওয়াসেডা বিশ্ববিদ্যালয়ে আজ জগদীশচন্দ্র বক্তৃতা করবেন। ইতিপূর্বেই জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কারের কাহিনী জাপানের বিজ্ঞানীরা শুনেছেন। ভারতীয় এই বিজ্ঞানীর প্রতি জাপানের অধিবাসীদের আগের থেকেই একটা সম্ভ্রম বোধ ছিল। বক্তৃতা শুরু হওয়ার আগের থেকেই সভাগৃহ কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে গেল। জগদীশচন্দ্রও ইতিমধ্যে শারীরিক ও মানসিক বল ফিরে পেয়েছেন। নতুন উদ্যমে তিনি বক্তৃতা শুরু করলেন। একের পর এক পরীক্ষা দ্বারা তিনি তাঁর গবেষণালব্ধ তথ্যকে প্রমাণ করলেন। সমবেত বিজ্ঞানিগণ তাঁদের চোখের সামনে প্রত্যক্ষ করলেন উদ্ভিদও

প্রাণীদের মত আঘাতে কাতর হয়, উত্তেজক পদার্থের প্রয়োগে উত্তেজিত হয়, অবসাদক দ্রব্যের প্রয়োগে অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে, ক্লোরোফর্ম প্রয়োগে জ্ঞান হারায় এবং বিষপ্রয়োগে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। বক্তৃতা শেষ হল। সমস্ত শ্রোতৃমণ্ডলী বিস্ময়ে হতবাক। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এত দিন তাঁরা যে ধারণা পোষণ করতেন যে, ভারতীয়রা শুধু দার্শনিকই হতে পারে তাদের মধ্যেও যে অসাধারণ বিজ্ঞান-প্রতিভা থাকতে পারে তা তাঁরা চিন্তা করতে পারে নি। আজ জগদীশচন্দ্রের বক্তৃতা শুনে এবং স্বউদ্ভাবিত যন্ত্রে নানা তথ্যের প্রমাণ চাক্ষুষ করে তাঁদের সেই আজন্ম লালিত ধারণা পাল্টে গেল। তাঁরা বিজ্ঞানে ভারতবর্ষকে ইউরোপের উন্নত দেশের সঙ্গে সমপর্যায়ভুক্ত বলে ভাবতে শিখল। বক্তৃতার শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি ডাঃ উকিটা জগদীশচন্দ্রকে ধন্যবাদ দিতে উঠে বললেন ভারতীয় বিজ্ঞানী আজ তাঁদের এক নতুন জ্ঞানরাজ্যে নিয়ে গেছেন। উদ্ভিদ-জীবনের অনেক অজানা রহস্যের দ্বার আজ তাঁদের কাছে উন্মোচিত হয়ে গেছে। এর জন্য জগদীশচন্দ্রকে ধন্যবাদ দেবার ভাষা তাঁর জানা নেই। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এত দিন তাঁরা জেনে এসেছেন যে ভারতবর্ষ কেবল মুনি-ঋষিদেরই দেশ। আজ তাঁরা জানলেন ভারতবর্ষ শুধু আধ্যাত্মিক আলোচনায় মগ্ন থাকে না, যেকোন উন্নত দেশের মত ভারতবর্ষের বিজ্ঞানীরাও মৌলিক গবেষণা করতে সক্ষম। প্রকৃতপক্ষে জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার উদ্ভিদজীবন সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার। এর জন্য শুধু জাপান নয় সমস্ত পৃথিবীর মানুষ জগদীশচন্দ্রের প্রতি চিরকৃতজ্ঞ থাকবে।

মার্কুইস টোকুগাওয়া ছিলেন সেই সময়ে জাপানের অন্যতম শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব। সেই মার্কুইস টোকুগাওয়া টোকিও শহরে নিজের প্রাসাদে জগদীশচন্দ্রের সম্মানে এক অভ্যর্থনার আয়োজন করলেন। জাপানের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা অধ্যাপক সেই অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়ে যোগদান করেছিলেন। সমবেত অধ্যাপকবৃন্দ সকলেই জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন।

একদিন জগদীশচন্দ্রের তিনজন সহকর্মী একটা নার্সারীতে কয়েকটি গাছ কিনতে গিয়েছেন। নার্সারীতে গিয়ে তাঁরা শুনলেন নার্সারীর মালিক তার দোকানের অন্যান্য কর্মচারীর সঙ্গে গাছপালা সম্বন্ধে জগদীশচন্দ্রেরই আবিষ্কার নিয়ে আলোচনা করছে। তারা যখন শুনল জগদীশচন্দ্রেরই সহকর্মীরা তাদের নার্সারীতে গাছ কিনতে এসেছেন তখন তাঁদের প্রতি সম্ভ্রমে নার্সারীর লোকদের মাথা নুইয়ে এল। তারা বিনা পয়সায় প্রয়োজনীয় গাছপালা জগদীশচন্দ্রের সহকর্মীদের হাতে তুলে দিল।

জাপানীরা নিজেদের গবেষণাগার বিদেশী বিজ্ঞানীদের দেখাতে সর্বদা অনীহা প্রকাশ করে থাকে। তার কারণ হয়তো বা বিজ্ঞানীরা তাঁদের কৃৎকৌশল জেনে নেবে এই আশঙ্কা তাঁদের মনে কাজ করে থাকে, কিন্তু জগদীশচন্দ্রের বেলায় ব্যাপারটা উল্‌টো হল। জগদীশচন্দ্র জাপানের যে গবেষণাগারেই গেছেন সেখানকার গবেষকরা সোৎসাহে নিজেদের গবেষণার বিষয়বস্তু জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এই ঘটনা থেকেই প্রমাণ হয় জাপানীরা জগদীশচন্দ্রকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী হিসেবে নিজেদের মনের মনিকোঠায় স্থান দিয়েছিল।

জগদীশচন্দ্রের স্বাস্থ্যের আগের থেকে অনেকটা উন্নতি হয়েছে। কিন্তু জাহাজে করে দেশে ফিরলে সমুদ্র ধকলে স্বাস্থ্যের আবার অবনতি হতে পারে। জাপানের ডাক্তাররা জগদীশচন্দ্রকে জাপানের মায়ানোসিটা নামে এক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে গিয়ে কিছুদিন বিশ্রাম নিতে বললেন। ওই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কাছেই উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। এই প্রস্রবণে স্নান করলে জগদীশচন্দ্রের স্বাস্থ্যের আরও উন্নতি হবে। জগদীশচন্দ্র মায়ানোসিটা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে দিন পনের থাকলেন। এতে সত্যি সত্যিই তাঁর স্বাস্থ্যের আরও উন্নতি হল। ফলে জগদীশচন্দ্র জাহাজে করে ভারতবর্ষের দিকে যাত্রা করলেন। প্রথমে গেলেন জাভায়। সেখানে "বিনটেন জর্গ" নামক জায়গায় তখনকার দিনের এক প্রখ্যাত উদ্যান দেখলেন। ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দে জগদীশচন্দ্র সহকর্মীদের

নিয়ে সিংহলে এসে পৌঁছলেন। প্রথমে গেলেন সিংহলের রাজধানী কলম্বোয়। সেখান থেকে জাহাজে করে সাত মাইল দূরবর্তী ধনুষ্কোটিতে এলেন। সেখান থেকে বিখ্যাত শিবমন্দির রামেশ্বরম মন্দিরে পূজা দিলেন। এরপর একে একে জগদীশচন্দ্র মাদুরা, তাঞ্জোর, ত্রিচিনোপল্লী, শ্রীরঙ্গপত্তম প্রভৃতি জায়গাগুলি পরিদর্শন করলেন। শ্রীরঙ্গপত্তম মন্দিরে সাধারণ তীর্থযাত্রীরা যা যা দর্শন করেন জগদীশচন্দ্র সহকর্মীদের নিয়ে সেইগুলিতো দেখলেনই, তাছাড়া মন্দিরের পূজারী যাঁরা ছিলেন তাঁরা জগদীশচন্দ্র এবং তাঁর সহকর্মীদের পার্শ্ববর্তী সবরকমের দেব-দেবীর মন্দির দেখালেন। জগদীশচন্দ্র পূজারীদের কাছে বললেন যে, তিনি গোঁড়া হিন্দু নন। এমনকি জাতিভেদও মানেন না। সুতরাং পূজারীরা তাঁকে মন্দিরে প্রবেশ করতে অনুমতি না দিলে তিনি দুঃখিত হবেন না। কিন্তু পূজারীরা জগদীশচন্দ্রের এই সরল স্বীকারোক্তিতে কর্ণপাত করলেন না। তাঁরা অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে জগদীশচন্দ্র এবং তাঁর সহকর্মীদের মন্দিরের ভেতরে নিয়ে গেলেন।

অবশেষে জগদীশচন্দ্র বাংলায় ফিরলেন। এ যাত্রায় প্রায় দু'বছর যাবৎ জগদীশচন্দ্র পাশ্চাত্যদেশ ভ্রমণ করলেন এবং প্রায় ২৬০০ মাইল পথ পরিক্রমা করে তাঁকে দেশে ফিরতে হল। এই দু'বছর পশ্চিমের যেখানেই গেছেন, পেয়েছেন শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীর সম্মান। তাঁর ভ্রমণের ফলে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বিশ্বের মানুষের আজন্মলালিত ভুল ধারণা দূর হয়েছে। তাঁরা জেনেছে ভারতবর্ষ শুধু আধ্যাত্মিকতাবাদেই শ্রেষ্ঠ নয়, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বিজ্ঞানেও তাঁরা পৃথিবীর যে কোন উন্নত দেশের বিজ্ঞানীদের সঙ্গে পাল্লা দিতে সক্ষম।

চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ :

১৯১৫ খ্রীস্টাব্দে জগদীশচন্দ্রের চাকরি জীবনের মেয়াদ শেষ হয়ে গেল। জগদীশচন্দ্রের মত একজন খ্যাতিমান বিজ্ঞানীকে তৎকালীন

ভারত সরকার পুরোপুরি অবসর দিতে চাইলেন না। তাঁরা জগদীশচন্দ্রকে প্রেসিডেন্সি কলেজের "ইমেরিটাস অধ্যাপক" নিযুক্ত করলেন। প্রসঙ্গক্রমে স্মর্তব্য যে ইমেরিটাস অধ্যাপক কেবলমাত্র তাঁদেরই নিয়োগ করা হয় যাঁরা আপন আপন ক্ষেত্রে উজ্জ্বল কর্মধারার সাক্ষর রেখেছেন। ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দে ভারত সরকার জগদীশচন্দ্রকে "স্যার" উপাধি দিয়ে সম্মানিত করলেন।

শিক্ষার জগৎ থেকে অবসর নিলেও জগদীশচন্দ্রের কর্মজীবন শেষ হল না। তিনি দার্জিলিং-এ এবং সিজবেড়িয়ায় নিজস্ব গবেষণাগার স্থাপন করলেন এবং সেই গবেষণাগারে গিয়ে গাছপালা সম্বন্ধে নিয়মিত গবেষণা চালিয়ে যেতে লাগলেন।

জগদীশচন্দ্র আজীবন মনের গহণকোণে একটা ইচ্ছা পোষণ করে আসছেন। তা হল একটি বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠা করা। সেই কাজ এখনও অসমাপ্ত রয়ে গেছে। ৩০শে নভেম্বর, ১৯৬৭ খ্রীস্টাব্দ হবে জগদীশচন্দ্রের উনষষ্ঠিতম জন্মদিন। ২৩ বছর আগে এই দিনেই জগদীশচন্দ্র তাঁর সমগ্র জীবন বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাজে উৎসর্গ করবেন বলে সংকল্প করেছিলেন। জগদীশচন্দ্র স্থির করলেন আগামী ২৩শে নভেম্বরই বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠা করবেন।

বসুবিজ্ঞান মন্দির ঃ

১৯১৭ খ্রীস্টাব্দের ৩০শে নভেম্বর উদ্দিষ্ট দিনেই আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু তাঁর বহু সাধের সাধনাস্থল এই বিজ্ঞান মন্দির স্থাপন করলেন। এই মন্দির প্রতিষ্ঠাকল্পে জগদীশচন্দ্র দীর্ঘ কুড়ি বছর যাবৎ অর্থ সংগ্রহ করেছেন। এর জন্য তাঁকে কম কৃচ্ছসাধন করতে হয়নি। এই মন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য দেশের কিছু মঙ্গলার্থী সাহায্যের হাত প্রসারিত করে দিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী এবং যুগোল কিশোর বিরলার নাম উল্লেখযোগ্য। চাকরি থেকে অবসর পেয়েই বিজ্ঞানের একনিষ্ঠ পূজারী আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু

বিজ্ঞান মন্দির নির্মাণ করতে উঠে পড়ে লাগলেন। কিন্তু গবেষণার কাজ একদিনের জন্যও স্থগিত রাখেন নি। সমুদ্রতল থেকে প্রায় ৭০০০ ফুট উঁচুতে দার্জিলিং পাহাড়ের ওপর মায়াপুরীতে জগদীশচন্দ্র একটি গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সেই গবেষণাগারটি নির্দিষ্ট করলেন উদ্ভিদ বিজ্ঞানের গবেষণা করবার জন্য।

উলুবেড়িয়ার নিকটস্থ সিজবেড়িয়াতে জগদীশচন্দ্র অনেক জমি সংগ্রহ করে একটি বাংলো নির্মাণ করেছিলেন। সেখানেও একটি গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করে জগদীশচন্দ্র গবেষণার কাজ করেছিলেন।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন 'জগদীশচন্দ্রের সুহৃদ এবং মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। তিনি বরাবরই জগদীশচন্দ্রকে উৎসাহ দিতেন বিজ্ঞান গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করার জন্য। কারণ তিনি জানতেন ভারতবর্ষের সত্যিকার কল্যাণ হবে যদি ভারতবাসী তাঁর অন্ধ কুসংস্কার দূর করে দিয়ে বিজ্ঞান মনস্ক হয়ে ওঠে। তাঁদের মধ্যে বিজ্ঞানচেতনা আনতে হলে বিজ্ঞানের প্রসার হওয়া প্রয়োজন। সেই কাজ করতে পারেন জগদীশচন্দ্রের মতই মনীষী বিজ্ঞানীরা। জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞান সাধনায় সব থেকে সহায় হবে উপযুক্ত গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা। কিন্তু জগদীশচন্দ্র যেদিন বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন সেইদিন গুরুদেব কলকাতায় ছিলেন না। তিনি তখন বিদেশে। কিন্তু এই বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠার ঘটনা গুরুদেবের মনকে অভিভূত করেছিল। বিদেশ থেকে তিনি জগদীশচন্দ্রকে লিখলেন—"তোমার বিজ্ঞান মন্দিরে প্রথম সভা উদ্বোধনের দিনে আমি যদি থাকতে পারতুম তা হলে আমার খুব আনন্দ হত। বিধাতা যদি দেশে ফিরিয়ে আনেন তাহলে তোমার এই বিজ্ঞান যজ্ঞশালায় একদিন তোমার সঙ্গে মিলনের উৎসব হবে এই কথা মনে রইল। এতদিন যা তোমার সঙ্কল্পের মধ্যে ছিল আজকে তার সৃষ্টির দিন এসেছে। কিন্তু এত তোমার একলার সঙ্কল্প নয়; এ আমাদের সমস্ত দেশের সঙ্কল্প, তোমার জীবনের মধ্য দিয়ে এর বিকাশ হতে চলল। জীবনের ভেতর দিয়েই জীবনের

উদ্বোধন হয়, তোমার প্রাণের সামগ্রীকে তুমি আমাদের দেশের প্রাণের সামগ্রী করে দিয়ে যাবে—তারপর থেকে সেই চিরন্তন প্রাণের প্রবাহে আপনিই সে এগিয়ে চলতে থাকবে।...” বসুবিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে গুরুদেব বিদেশ থেকে নিম্নোক্ত কবিতাটি রচনা করে পাঠিয়েছিলেন :—

আবাহন

মাতৃমন্দির পুণ্য অঙ্গনে
কর মহোজ্জ্বল আজ হে !
শুভ শঙ্খ বাজহ বাজ হে !
ঘন তিমির রাত্রির চির প্রতীক্ষা
পূর্ণ কর, লহ জ্যোতি দীক্ষা,
যাত্রিদল সব সাজ হে !
শুভ শঙ্খ বাজহ বাজহে।
বল “জয় নরোত্তম, পুরুষ সত্তম,
জয় তপস্বী রাজ হে।
জয় হে, জয় হে, জয় হে।
এস বজ্র মহাদনে, মাতৃ আশীর্ভাষণে,
সকল সাধক এস হে, ধন্য কর এ দেশ হে !
সকল যোগী, সকল ত্যাগী,
এস দুঃসহ দুঃখ ভাগী,
এস দুর্জয় শক্তি সম্পদ
মুক্ত বন্ধ সমাজ হে !
এস জ্ঞানী, এস কর্মী,
নাশ ভারত লাজ হে !
এস মঙ্গল, এস গৌরব,
এস অক্ষয় পুণ্য সৌরভ,

এস তেজঃ সূর্য উজ্জ্বল
কীর্তি অম্বর মাঝ হে !
বীর ধর্মে পুণ্য কর্মে
বিশ্বহৃদয়ে রাজ হে !
শুভ শঙ্খ বাজহ বাজহে !
জয় জয় নরোত্তম, পুরুষ সত্তম,
জয় তপস্বী রাজহে।
জয় হে, জয় হে, জয় হে।

বসুবিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে ওই মন্দিরের আচার্য জগদীশচন্দ্র যে ভাষণ পাঠ করেছিলেন তা একটি ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। সেই ভাষণটি নিম্নরূপ :—

নিবেদন :

"বাইশ বৎসর পূর্বে যে স্মরণীয় ঘটনা হইয়াছিল, তাহাতে সেদিন দেবতার করুণা জীবনে বিশেষরূপে অনুভব করিয়াছিলাম। সেদিন যে মানস করিয়াছিলাম, এতদিন পরে তাহাই দেবচরণে নিবেদন করিতেছি। আজ যাহা প্রতিষ্ঠা করিলাম তাহা মন্দির, কেবলমাত্র পরীক্ষাগার নহে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সত্য, পরীক্ষা দ্বারা নির্ধারিত হয়, কিন্তু ইন্দ্রিয়ের অতীত দুই একটি মহাসত্য আছে, তাহা লাভ করিতে হইলে কেবলমাত্র বিশ্বাস করিতে হয়। বৈজ্ঞানিক সত্য পরীক্ষা দ্বারা প্রতিপন্ন হয়। তাহার জন্যও অনেক সাধনার আবশ্যক। যাহা কল্পনার রাজ্যে ছিল, তাহা ইন্দ্রিয়গোচর করিতে হয়। এই আলোটা চক্ষুর অদৃশ্য ছিল, তাহাকে চক্ষুগ্রাহ্য করিতে হইবে। শরীর নির্মিত ইন্দ্রিয় যখন পরাস্ত হয় তখন ধাতু-নির্মিত অতীন্দ্রিয়ের শরণাপন্ন হই। যে জগৎ কিয়ৎক্ষণ পূর্বে অশব্দ ও অন্ধকারময় ছিল এখন তাহার গভীর নির্ঘোষ ও দুঃসহ আলোকরাশিতে একেবারে অভিভূত হইয়া পড়ি।

এই সকল একেবারে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য না হইলেও মনুষ্যনির্মিত কৃত্রিম ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধি করা যাইতে পারে। কিন্তু আরো অনেক ঘটনা আছে, যাহা ইন্দ্রিয়েরও অগোচর। তাহা কেবল বিশ্বাস বলেই লাভ করা যায়। বিশ্বাসের সত্যতা সম্বন্ধেও পরীক্ষা আছে; তাহা দুই একটি ঘটনার দ্বারা হয় না, তাহার প্রকৃত পরীক্ষা করিতে সমগ্র জীবনব্যাপী সাধনার আবশ্যক। সেই সত্য প্রতিষ্ঠার জন্যই মন্দির উত্থিত হইয়া থাকে।

কি সেই মহাসত্য যাহার জন্য এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইল? তাহা এই যে, মানুষ যখন তাহার জীবন ও আরাধনা কোন উদ্দেশ্যে নিবেদন করে, সেই উদ্দেশ্য কখনও বিফল হয় না; এখন অসম্ভবও সম্ভব হইয়া থাকে। সাধারণের সাধুবাদ শ্রবণ আজ আমার উদ্দেশ্য নহে; কিন্তু যাঁহারা কর্মসাগরে ঝাঁপ দিয়াছেন এবং প্রতিকূল তরঙ্গাঘাতে মৃতকল্প হইয়া অদৃষ্টের নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে উদ্যত হইয়াছেন, আমার কথা বিশেষভাবে কেবল তাঁহাদেরই জন্য।"

পরীক্ষা:

"যে পরীক্ষার কথা বলিব তাহা শেষ করিতে দু'টি জীবন লাগিয়াছে। যেমন একটি ক্ষুদ্র লতিকার পরীক্ষায় সমস্ত উদ্ভিদজীবনের প্রকৃত সত্য আবিষ্কৃত হয়, সেইরূপ একটি মনুষ্যজীবনের বিশ্বাসের ফলদ্বারা বিশ্বাস রাজ্যের সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এই জন্যই স্বীয় জীবনে পরীক্ষিত সত্য সম্বন্ধে যে দু' একটি কথা বলিব তাহা ব্যক্তিগত কথা ভুলিয়া সাধারণভাবে গ্রহণ করিবেন। পরীক্ষার আরম্ভ পিতৃদেব স্বর্গীয় ভগবানচন্দ্র বসুকে লইয়া তাহা অর্ধশতাব্দী পূর্বের কথা। তাঁহারই নিকট আমার শিক্ষা এবং দীক্ষা। তিনি শিখাইয়াছিলেন, অন্যের উপর প্রভুত্ব বিস্তার অপেক্ষা নিজের জীবন-শাসন বহুগুণে শ্রেয়স্কর, জনহিতকর নানা কার্যে তিনি নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। শিক্ষা, শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতিকল্পে তিনি তাঁহার

সকল চেষ্টা ও সর্বস্ব নিয়োজিত করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়াছিল। সুখ-সম্পদের কোমল শয্যা হইতে তাঁহাকে দারিদ্র্যের লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছিল। সকলেই বলিত, তিনি তাঁহার জীবন ব্যর্থ করিয়াছিলেন। এই ঘটনা হইতেই সফলতা কত ক্ষুদ্র এবং কোন কোন বিফলতা কত বৃহৎ, তাহা শিখিতে পারিয়াছিলাম। পরীক্ষার প্রথম অধ্যায় এই সময় লিখিত হইয়াছিল।”

“তাহার পর বত্রিশ বৎসর হইল শিক্ষকতার কার্য গ্রহণ করিয়াছি। বিজ্ঞানের ইতিহাস ব্যাখ্যায় আমাকে বহু দেশবাসী মনস্বীগণের নাম স্মরণ করাইতে হইত। কিন্তু তাহার মধ্যে ভারতের স্থান কোথায়। শিক্ষাকার্যে অন্যে যাহা বলিয়াছে, সেই সকল কথাই শিখাইতে হইত। ভারতবাসীরা সে ভাবপ্রবণ ও স্বপ্নাবিষ্ট, অনুসন্ধানকার্য কোনদিনই তাহাদের নহে, সেই একই কথা চিরদিন শুনিয়া আসিতাম। বিলাতের ন্যায় এদেশে পরীক্ষাগার নাই, সূক্ষ্ম যন্ত্র নির্মাণও এদেশে কোনদিন হইতে পারে না, তাহাও কতবার শুনিয়াছি। তখন মনে হইল, যে ব্যক্তি পৌরুষ হারাইয়াছে কেবল সে-ই বৃথা পরিতাপ করে। অবসাদ দূর করিতে হইবে, দুর্বলতা ত্যাগ করিতে হইবে। ভারতই আমাদের কর্মভূমি, সহজপন্থা আমাদের জন্য নহে। তেইশ বৎসর পূর্বে অদ্যকার দিনের এই সকল কথা স্মরণ করিয়া একজন তাহার সমগ্র মন-প্রাণ ও সাধনা ভবিষ্যতের জন্য নিবেদন করিয়াছিল। তাহার ধনবল কিছুই ছিল না, তাহার পথপ্রদর্শকও কেহ ছিল না। বহু বৎসর ধরিয়া একাকী তাহাকে প্রতিদিন প্রতিকূল অবস্থার সহিত যুঝিতে হইয়াছিল। এতদিন পরে তাহার নিবেদন সার্থক হইয়াছে।”

জয়পরাজয়ঃ

“তেইশ বৎসর পূর্বে অদ্যকার দিনে যে আশা লইয়া কার্য আরম্ভ করিয়াছিলাম, দেবতার করুণায় তিন মাসের মধ্যে প্রথম ফল ফলিয়াছিল। জার্মানীতে আচার্য হার্টস বিদ্যুৎ-তরঙ্গ সম্বন্ধে যে দুরূহ

কার্য আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহার বহুল বিস্তার ও পরিণতি এখানেই সম্ভাবিত হইয়াছিল। কিন্তু এদেশের কোন এক প্রসিদ্ধ সভাতে আমার আবিষ্ক্রিয়ার সংবাদ যখন পাঠ করি তখন সভাস্থ কোন সভ্যই আমার কার্য সম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ করিলেন না। বুঝিতে পারিলাম ভারতবাসীর বৈজ্ঞানিক কৃতিত্ব সম্বন্ধে তাঁহারা একান্ত সন্দিহান। অতঃপর আমার দ্বিতীয় আবিষ্কার বর্তমান কালের সর্বপ্রধান পদার্থবিদের নিকট প্রেরণ করি। আজ বাইশ বৎসর পরে তাহার উত্তর পাইলাম। তাহাতে অবগত হইলাম সে, আমার আবিষ্ক্রিয়া রয়েল সোসাইটি দ্বারা প্রকাশিত হইবে এবং এই তথ্য ভবিষ্যতে বৈজ্ঞানিক উন্নতির সহায়ক হইবে বলিয়া পার্লামেণ্ট কর্তৃক প্রদত্ত বৃত্তি আমার গবেষণাকার্যে নিয়োজিত হইবে। সেই দিনে ভারতের সম্মুখে যে দ্বার অর্গলিত ছিল তাহা সহসা উন্মুক্ত হইল। আর কেহ সেই উন্মুক্ত দ্বার রোধ করিতে পারিবে না। সেইদিন যে অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছে তাহা কখনও নির্বাপিত হইবে না।"

"এই আশা করিয়াই আমি বৎসরের পর বৎসর অক্লান্ত মন ও শরীর লইয়া কার্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছিলাম। কিন্তু মানুষের প্রকৃত পরীক্ষা একদিনে হয় না, সমস্ত জীবন তাহাকে আশা ও নৈরাশ্যের মধ্য দিয়া পুনঃ পুনঃ পরীক্ষিত হইতে হয়। যখন আমার বৈজ্ঞানিক প্রতিপত্তি আশাতীত উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিল তখনই সমস্ত জীবনের কৃতিত্ব ব্যর্থপ্রায় হইতেছিল।"

"তখন তারহীন সংবাদ ধরিবার কল নির্মাণ করিয়া পরীক্ষা করিতেছিলাম। দেখিলাম, হঠাৎ কলের সাড়া কোন অজ্ঞাত কারণে বন্ধ হইয়া গেল। মানুষের লেখাভঙ্গী হইতে তাহার শারীরিক দুর্বলতা ও ক্লান্তি যেমন অনুমান করা যায়, কলের সাড়া-লিপিতে সেই একইরূপ চিহ্ন দেখিলাম। আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, বিশ্রামের পর কলের ক্লান্তি দূর হইল এবং পুনরায় সাড়া দিতে লাগিল। উত্তেজক ঔষধ প্রয়োগে তাহার সাড়া দিবার শক্তি বাড়িয়া গেল এবং বিষ

প্রয়োগে তাহার সাড়া একেবারে অন্তর্হিত হইল। যে সাড়া দিবার শক্তি জীবনের এক প্রধান চিহ্ন বলিয়া গণ্য হইত, জড়েও তাহার ক্রিয়া দেখিতে পাইলাম। এই অত্যাশ্চর্য ঘটনা আমি রয়েল সোসাইটির সমক্ষে পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে প্রচলিত মত-বিরুদ্ধ বলিয়া জীবতত্ত্ববিদ্যার দুই একজন অগ্রণী ইহাতে অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। তদ্ভিন্ন আমি পদার্থবিদ, আমার স্বীয় গণ্ডী ত্যাগ করিয়া জীবতত্ত্ববিদের নূতন জাতিতে প্রবেশ করিবার অনধিকার চেষ্টা রীতিবিরুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হইল। তাহার পর আরও দুই একটি অশোভন ঘটনা ঘটিয়াছিল। যাঁহারা আমার বিরুদ্ধ পক্ষে ছিলেন তাঁহাদেরই মধ্যে একজন আমার আবিষ্কার পরে নিজের বলিয়া প্রকাশ করেন। এই বিষয়ে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। ফলে, বহু বৎসর যাবৎ আমার সমুদয় কার্য পণ্ডপ্রায় হইয়াছিল। এতকাল একদিনের জন্য মেঘরাশি ভেদ করিয়া আলোকের মুখ দেখিতে পাই নাই। এই সকল স্মৃতি অতিশয় ক্লেশকর। বলিবার একমাত্র আবশ্যকতা এই যে, যদি কেহ কোন মহৎ কার্যে জীবন উৎসর্গ করিতে উন্মুখ হন, তিনি যেন ফলাফলে নিরপেক্ষ হইয়া থাকেন। যদি অসীম ধৈর্য থাকে, কেবল তাহা হইলেও বিশ্বাস-নয়নে কোনদিন দেখিতে পাইবেন, বারংবার পরাজিত হইয়াও সে পরান্মুখ হয় নাই সেই একদিন বিজয়ী হইবে।"

বীরনীতি ঃ

"বর্তমান উদ্ভিদবিদ্যার অসীম উন্নতি লাইপজিগের জার্মান অধ্যাপক ফেফাবের অর্ধশতাব্দীর অসাধারণ কৃতিত্বের ফল। আমার কোন কোন আবিষ্ক্রিয়া ফেফাবের কয়েকটি মতের বিরুদ্ধে। তাঁহার অসন্তোষ উৎপাদন করিয়াছি মনে করিয়া আমি লাইপজিগ না গিয়া ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়াছিলাম। সেখানে ফেফার তাঁহার সহযোগী অধ্যাপককে আমায় নিমন্ত্রণ করিবার জন্য

প্রেরণ করেন। তিনি বলিয়া পাঠাইলেন যে, আমার প্রতিষ্ঠিত নূতন তত্ত্বগুলি জীবনের সন্ধ্যার সময় তাঁহার নিকট পৌঁছিয়াছে, তাহার দুঃখ রহিল যে, এই সকল সত্যের পরিণতি তিনি এ জীবনে দেখিয়া যাইতে পারিলেন না। যাঁহার বৈরীভাব আশঙ্কা করিয়াছিলাম তিনিই মিত্র রূপে আমাকে গ্রহণ করিলেন। ইহাই তো চিরন্তন রীতিনীতি, যাহা আপনার পরাভবের মধ্যেও সত্যের জয় দেখিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হয়। তিন সহস্র বৎসর পূর্বে এই বীর-ধর্ম কুরুক্ষেত্রে প্রচারিত হইয়াছিল। অগ্নিবাণ আসিয়া যখন ভীষ্মদেবের মর্মস্থান বিদ্ধ করিল তখন তিনি আনন্দের আবেগে বলিয়াছিলেন—'সার্থক আমার শিক্ষাদান। এই বাণ শিখণ্ডীর নহে, ইহা আমার প্রিয়শিষ্য অর্জুনের।'

"পৃথিবী পর্যটন ও স্বীয় জীবনের পরীক্ষা দ্বারা বুঝিতে পারিয়াছে যে, নূতন সত্য আবিষ্কার করিবার জন্য সমস্ত জীবন পণ ও সাধনার আবশ্যক। জগতে তাহার প্রচার আরও দুরূহ। ইহাতে আমার পূর্ব-সংকল্প দৃঢ়তর হইয়াছে। বহুদিন সংগ্রামের পর ভারত বিজ্ঞান ক্ষেত্রে যে স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছে তাহা যেন চিরস্থায়ী হয়। আমার কার্য যাহারা অনুসরণ করিবেন তাঁহাদের পথ যেন কোনদিন অবরুদ্ধ না হয়।"

বিজ্ঞান প্রচারে ভারতের দান ঃ

"বিজ্ঞান তো সার্বভৌমিক। তবে বিজ্ঞানের মহাক্ষেত্রে এমনকি কোন স্থান আছে যাহা ভারতীয় সাধক ব্যতীত অসম্পূর্ণ থাকিবে ? তাহা নিশ্চয়ই আছে। বর্তমান কালে বিজ্ঞানের প্রসার বহু বিস্তৃত হইয়াছে এবং প্রতীচ্য দেশে কার্যের সুবিধার জন্য তাহা বহুধা বিভক্ত হইয়াছে এবং বিভিন্ন শাখার মধ্যে অভেদ্য প্রাচীর উত্থিত হইয়াছে। দৃশ্য জগৎ অতি বিচিত্র এবং বহুরূপী। এত বিভিন্নতার মধ্যে যে কিছু সাম্য আছে তাহা বোধগম্য হয় না। সতত চঞ্চল প্রাণী, আর এই চিরমৌন অবিচলিত উদ্ভিদ, ইহাদের মধ্যে কোন সাদৃশ্য দেখা যায় না।

আর এই উদ্ভিদের মধ্যে একই কারণে বিভিন্ন রূপ সাড়া দেখা যায়। কিন্তু এত বৈষম্যের মধ্যেও ভারতীয় চিন্তাপ্রণালী একতার সন্ধানে জড়, উদ্ভিদ ও জীবের মধ্যে সেতু বাঁধিয়াছে। এতদর্থে ভারতীয় সাধক কখনও তাহার চিন্তা কল্পনার উন্মুক্ত রাজ্যে অবাধে প্রেরণ করিয়াছে এবং পরমুহূর্তেই তাহাকে শাসনের অধীনে আনিয়াছে। আদেশের বলে জড়বৎ নূতন প্রাণ সঞ্চার করিয়াছে এবং যে স্থলে মানুষের ইন্দ্রিয় পরাস্ত হইয়াছে তথায় কৃত্রিম অতীন্দ্রিয় সৃজন করিয়াছে। তাহা দিয়া এবং অসীম ধৈর্য সম্বল করিয়া অব্যক্ত জগতের সীমাহীন রহস্যের, পরীক্ষা প্রণালীতে স্থির প্রতিষ্ঠা করিবার সাহস বাঁধিয়াছে। যাহা চক্ষুর অগোচর ছিল তাহা দৃষ্টিগোচর করিয়াছে। কৃত্রিম চক্ষু পরীক্ষা করিয়া মনুষ্য দৃষ্টির অভাবনীয় এমন এক নূতন রহস্য আবিষ্কার করিয়াছে যে, তাহার দু'টি চক্ষু এক সময়ে জাগরিত থাকে না ; পর্যায়ক্রমে একটি ঘুমায়, আর একটি জাগিয়া থাকে। ধাতু পাত্রে লুক্কায়িত স্মৃতির অদৃশ্য ছাপ প্রকাশিত করিয়া দেখাইয়াছি। অদৃশ্য আলোক সাহায্যে কৃষ্ণ প্রস্তরের ভিতরের নির্মাণ কৌশল বাহির করিয়াছে। আণবিক কারুকার্য ঘূর্ণমান বিদ্যুৎ-উর্মির দ্বারা দেখাইয়াছে। বৃক্ষজীবনে মানবীয় জীবনের প্রতিকৃতি দেখাইয়া নির্বাক জীবনের উত্তেজনা মানবের অনুভূতির অন্তর্গত করিয়াছে। বৃক্ষের অদৃশ্য বৃদ্ধি মাপিয়া লইয়াছে এবং বিভিন্ন আহার ও ব্যবহারে সেই বৃদ্ধি মাত্রার পরিবর্তন মুহূর্তে ধরিয়াছে। মনুষ্য-স্পর্শেও যে বৃক্ষ সঙ্কুচিত হয়, তাহা প্রমাণ করিয়াছে। যে উত্তেজক মানুষকে উৎফুল্ল করে, যে মাদক তাহাকে অবসন্ন করে, যে বিষ তাহার প্রাণনাশ করে, উদ্ভিদেও তাহাদের একই বিষক্রিয়া প্রমাণিত করিতে সমর্থ হইয়াছে। বিষে অবসন্ন মুমূর্ষু উদ্ভিদকে ভিন্ন বিষ প্রয়োগ দ্বারা পুনর্জীবিত করিয়াছে। উদ্ভিদপেশীর স্পন্দন লিপিবদ্ধ করিয়া তাহাতে হৃদয় স্পন্দনের প্রতিচ্ছায়া দেখাইয়াছে। বৃক্ষশরীরে স্নায়ুপ্রবাহ আবিষ্কার করিয়া তাহার বেগ নির্ণয় করিয়াছে। প্রমাণ করিয়াছে যে, যে সকল

কারণে মানুষের স্নায়ুর উত্তেজনা বর্ধিত বা মন্দীভূত হয় সেই একই কারণে উদ্ভিদ-স্নায়ুর আবেগও উত্তেজিত অথবা প্রশমিত হয়। এই সকল কথা কল্পনাপ্রসূত নহে। যে সকল অনুসন্ধান আমার পরীক্ষাগারে গত তেইশ বৎসর ধরিয়া পরীক্ষিত এবং প্রমাণিত হইয়াছে ইহা তাহারই অতি সংক্ষিপ্ত ও অপরিপূর্ণ ইতিহাস। যে সকল অনুসন্ধানের কথা বলিলাম তাহাতে নানা পথ দিয়া পদার্থবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা, এমনকি মনস্তত্ত্বও এক কেন্দ্রে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। বিধাতা যদি বিজ্ঞানের কোন বিশেষ তীর্থ ভারতীয় সাধকের জন্য নির্দেশ করিয়া থাকেন তবে এই চতুর্বেণী সঙ্গমই সেই মহাতীর্থ।"

আশা ও বিশ্বাস ঃ

"এই সকল অনুসন্ধান বিজ্ঞানের বহু শাখা লইয়া। কেহ কেহ মনে করেন ইহাদের বিনাশে নানা ব্যবহারিক বিদ্যার উন্নতি এবং জগতের কল্যাণ সাধিত হইবে। যে সকল আশা ও বিশ্বাস লইয়া আমি এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করিলাম তাহা কি একজনের জীবনের সঙ্গেই সমাপ্ত হইবে? একটি মাত্র বিষয়ের জন্য বীক্ষণাগার নির্মাণে অপরিমিত ধনের আবশ্যক হয়; আর এইরূপ অতি বিস্তৃত এবং বহুমুখী জ্ঞানের বিস্তার যে আমাদের দেশের পক্ষে অসম্ভব, এ কথা বিজ্ঞজন মাত্রেই বলিবেন। কিন্তু আমি অসম্ভাব্য বিষয়ের উপলক্ষে কেবলমাত্র বিশ্বাসের বলেই চিরজীবন চলিয়াছি ইহা তাহারই মধ্যে অন্যতম। "হইতে পারে না" বলিয়া কোনদিন পরাঙ্মুখ হই নাই; এখনও হইব না। আমার যাহা নিজস্ব বলিয়া মনে করিয়াছিলাম তাহা এই কার্যেই নিয়োগ করিব। রিক্ত হস্তে আসিয়াছিলাম, রিক্ত হস্তেই ফিরিয়া যাইব; ইতিমধ্যে যদি কিছু সম্পাদিত হয় তাহা দেবতার প্রসাদ বলিয়া মানিব। আর একজনও এই কার্যে তাঁহার সর্বস্ব নিয়োগ করিবেন, যাঁহার সাহচর্য আমার দুঃখ এবং পরাজয়ের মধ্যেও বহুদিন অটল রহিয়াছে। বিধাতার করুণা হইতে কোনদিন একেবারে বঞ্চিত

হই নাই। যখন আমার বৈজ্ঞানিক কৃতিত্বে অনেকে সন্দিহান ছিলেন তখনও দু' একজনের বিশ্বাস আমাকে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছিল। আজ তাঁহারা মৃত্যুর পরপারে।"

আশঙ্কা হইয়াছিল, কেবলমাত্র ভবিষ্যতের অনিশ্চিত বিধানের উপরেই এই মন্দিরের স্থায়িত্ব নির্ভর করিবে। অল্পদিন হইল বুঝিতে পারিয়াছি যে, আমি যে আশায় কার্য আরম্ভ করিয়াছি তাহার আহ্বান ভারতের দূর স্থানেও মর্ম স্পর্শ করিয়াছে। এই সকল দেখিয়া মনে হয়, আমি যে বৃহৎ সঙ্কল্প করিয়াছিলাম তাহার পরিণতি একেবারে অসম্ভব নহে। জীবিত থাকিতেই হয়তো দেখিতে পাইব যে এই মন্দিরের শূন্য অঙ্গন দেশ-বিদেশ হইতে সমাগত যাত্রী দ্বারা পূর্ণ হইয়াছে।"

আবিষ্কার এবং প্রচার ঃ

"বিজ্ঞান অনুশীলনের দুইটি দিক আছে। প্রথমত ; নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার ; ইহাই এই মন্দিরের মুখ্য উদ্দেশ্য। তাহার পর, জগতে সেই নূতন তত্ত্ব প্রচার। সেই জন্যই এই সুবৃহৎ বক্তৃতাগৃহ নির্মিত হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা ও তাহার পরীক্ষার জন্য এইরূপ গৃহ বোধহয় অন্য কোথাও নির্মিত হয় নাই। দেড় সহস্র শ্রোতার এখানে সমাবেশ হইতে পারিবে। বিজ্ঞান সম্বন্ধে এই মন্দিরে যে সকল আবিষ্ক্রিয়া হইয়াছে সেই সকল নূতন সত্য এ স্থানে পরীক্ষা সহকারে সর্বাগ্রে প্রচারিত হইবে। সর্ব জাতির সকল নরনারীর জন্য মন্দিরের দ্বার চিরদিন উন্মুক্ত থাকিবে। মন্দির হইতে প্রচারিত পত্রিকা দ্বারা নব নব প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব জগতে পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট বিজ্ঞাপিত হইবে এবং হয়তো তদ্দারা ব্যবহারিক বিজ্ঞানেরও উন্নতি সাধিত হইবে।"

"আমার আরও অভিপ্রায় এই যে, এ মন্দিরের শিক্ষা হইতে বিদেশবাসীও বঞ্চিত হইবে না। বহু শতাব্দী পূর্বে ভারতে জ্ঞান

সার্বভৌম রূপে প্রচারিত হইয়াছিল। এইদেশে নালন্দা ও তক্ষশিলায় দেশ দেশান্তর হইতে আগত শিক্ষার্থী সাদরে গৃহীত হইয়াছিল। যখনই আমাদের দিবার শক্তি জন্মিয়াছে তখনই আমরা মহৎ রূপে দান করিয়াছি—ক্ষুদ্রে কখনই আমাদের তৃপ্তি নাই। সর্বজীবনের স্পর্শে আমাদের জীবন প্রাণময়। যাহা সত্য, যাহা সুন্দর, তাহাই আমাদের আরাধ্য। শিল্পী কারুকার্যে এই মন্দির মণ্ডিত করিয়াছেন এবং চিত্রকর আমাদের হৃদয়ের অব্যক্ত আকাঙ্ক্ষা চিত্রপটে বিকশিত করিয়াছেন।"

"আমি যে উদ্ভিদের কথা বলিয়াছি তাহা আমাদের জীবনেরই প্রতিধ্বনি। সে জীবন আহত হইয়া মুমূর্ষু প্রায় হয় এবং ক্ষণিক মূর্ছা হইতে পুনরায় জাগিয়া উঠে। এই আঘাতের দুইটি দিক আছে; আমরা সেই দুইয়ের সংযোগস্থলে বর্তমান। একদিকে জীবনের, অপর দিকে মৃত্যুর পথ প্রসারিত। জীবের স্পন্দন আঘাতেরই ক্রিয়া, যে আঘাত হইতে আমরা পুনরায় উঠিতে পারি। প্রতি মুহূর্তে আমরা আঘাত দ্বারা মুমূর্ষু হইতেছি এবং পুনরায় সঞ্জীবিত হইতেছি। আঘাতের বলেই জীবনের শক্তি বর্ধিত হইতেছে। তিল তিল করিয়া মরিতেছি বলিয়াই আমরা বাঁচিয়া রহিয়াছি।"

"একদিন আসিবে যখন আঘাতের মাত্রা ভীষণ হইবে; তখন যাহা হেলিয়া পড়িবে তাহা আর উঠিবে না; অন্য কেহও তাহাকে তুলিয়া ধরিতে পারিবে না। ব্যর্থ তখন স্বজনের ক্রন্দন, ব্যর্থ তখন সতীর জীবনব্যাপী ব্রত ও সাধনা। কিন্তু যে মৃত্যুর স্পর্শে সমুদয় উৎকণ্ঠা ও চাঞ্চল্য শান্ত হয় তাহার রাজত্ব কোন্ কোন্ দেশ লইয়া? কে ইহার রহস্য উদ্ঘাটন করিবে? অজ্ঞান তিমিরে আমরা একেবারে আচ্ছন্ন। চক্ষুর আবরণ অপসারিত হইলেই এই ক্ষুদ্র বিশ্বের পশ্চাতে অচিন্তনীয় নূতন বিশ্বের অনন্ত ব্যাপ্তিতে আমরা অভিভূত হইয়া পড়ি।"

কে মনে করিতে পারিত, এই আর্তনাদ বিহীন উদ্ভিদজগতে এই তুষ্ণীভূত অসীম জীবসঞ্চারে অনুভূতি শক্তি বিকশিত হইয়া উঠিতেছে।

তাহার পর কি করিয়াই বা স্নায়ুসূত্রের উত্তেজনা হইতে তাহারই ছায়ারূপিণী অশরীরী স্নেহ মমতা উদ্ভূত হইল। ইহার মধ্যে কোন্‌টা অজর, কোন্‌টা অমর। যখন এই ক্রীড়াশীল পুত্তলিদের খেলা শেষ হইবে এবং তাহাদের দেহাবশেষ পঞ্চভূতে মিশিয়া যাইবে, অথবা অধিকতর রূপে পরিস্ফুট হইবে ?"

"কোন্ রাজ্যের উপর তবে মৃত্যুর অধিকার ? মৃত্যুই যদি মনুষ্যের একমাত্র পরিণাম তবে ধন-ধান্যে পূর্ণা পৃথিবী লইয়া সে কি করিবে ? কিন্তু মৃত্যু সর্বজয়ী নহে ; জড় সমষ্টির উপরই কেবল তাহার আধিপত্য। মানব চিন্তাপ্রসূত স্বর্গীয় অগ্নি, মৃত্যুর আঘাতেও নির্বাপিত হয় না। অমরত্বের বীজ চিন্তায়, বিত্তে নহে। মহা-সাম্রাজ দেশবিজয়ে কোনদিন স্থাপিত হয় নাই। তাহার প্রতিষ্ঠা কেবল চিন্তা ও দিব্যজ্ঞান প্রাচর দ্বারা সাধিত হইয়াছে। বাইশ শত বৎসর পূর্বে এই ভারতখণ্ডেই অশোক যে মহাসাম্রাজ্য করিয়াছিলেন তাহা কেবল শারীরিক বল ও পার্থিব ঐশ্বর্য দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। সেই মহাসাম্রাজ্যে যাহা সঞ্চিত হইয়াছিল তাহা কেবল বিতরণের জন্য এবং জীবের কল্যাণের জন্য। জগতের মুক্তি-হেতু সমস্ত বিতরণ করিয়া এমন দিন আসিল যখন সেই সসাগরা ধরণীর অধিপতি অশোকের অর্ধ আমলক মাত্র অবশিষ্ট রহিল। তখন তাহা হস্তে লইয়া তিনি কহিলেন—এখন ইহাই আমার সর্বস্ব, ইহাই যেন আমার চরম দানরূপে গৃহীত হয়।"

অর্ঘ্য ঃ

"এই আমলকের চিহ্ন মন্দির গাত্রে গ্রথিত রহিয়াছে। পতাকা স্বরূপ সর্বোপরি বজ্রচিহ্ন প্রতিষ্ঠিত—যে দৈব অস্ত্র নিষ্পাপ দধীচি মুনির অস্থি দ্বারা নির্মিত হইয়াছিল। যাঁহারা পরার্থে জীবন দান করেন তাঁহাদের অস্থি দ্বারাই বজ্র নির্মিত হয়, যাহার জ্বলন্ত তেজে জগতে দানবের বিনাশ ও দেবত্বের প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে। আজ আমাদের

অর্ঘ্য আমূলক মাত্র, কিন্তু পূর্বদিনের মহিমা মহত্তর হইয়া পুনর্জন্ম লাভ করিবেই করিবে। এই আশা লইয়া অদ্য আমরা ক্ষণকালের জন্য এখানে দাঁড়াইলাম। কল্য হইতে পুনরায় কর্মস্রোতে জীবনতরী ভাসাইব। আজ কেবল আরাধ্যা দেবীর পূজার অর্ঘ্য লইয়া এখানে আসিয়াছি। তাঁহার প্রকৃত স্থান বাহিরে নহে, হৃদয় মন্দিরে। তাঁহার প্রকৃত উপকরণ ভক্তের বাহুবলে, অন্তরের শক্তিতে এবং হৃদয়ের ভক্তিতে। তাহার পর সাধক কি আশীর্বাদ আকাঙ্ক্ষা করিবে। যখন প্রদীপ্ত জীবন নিবেদন করিয়াও তাহার সাধনার সমাপ্তি হইবে না, যখন পরাজিত ও মুমূর্ষু হইয়া সে মৃত্যুর অপেক্ষা করিবে, তখনই আরাধ্যা দেবী তাহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইবেন। এইরূপ পরজন্মের মধ্য দিয়াই সে তাহার পুরস্কার লাভ করিবে।"

পঞ্চম বারের জন্য ইউরোপ যাত্রা ঃ

১৯১৯ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর মাসে যখন জগদীশচন্দ্র পঞ্চম বারের জন্য ইংলণ্ডে আসেন তার আগেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ হয়ে গেছে। সেই যুদ্ধের প্রকোপে সমগ্র ইউরোপ বিধ্বস্ত। তাই এবারের ইউরোপ যাত্রার আগে জগদীশচন্দ্রের মনে আশঙ্কা ছিল যুদ্ধ-বিধ্বস্ত ইংলণ্ড হয়ত আগের মত অভ্যর্থনা জানাবে না। কিন্তু জগদীশচন্দ্রকে অবাক করে দিয়ে ইংলণ্ড আগের বারের থেকেও বেশী সমাদরের সঙ্গে তাঁকে বরণ করল। একের পর এক তিনি রয়াল ইনস্টিটিউশন, কেম্ব্রিজ, অক্সফোর্ড ইত্যাদি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বক্তৃতা করবার জন্য আমন্ত্রণ পেতে লাগলেন।

তখনকার ভারত সচিব ছিলেন লর্ড মণ্টেগু। এবার জগদীশচন্দ্রের ইংলণ্ডে আসার মূল উদ্দেশ্য ছিল লর্ড মণ্টেগুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করা। জগদীশচন্দ্র ভেবেছিলেন সে প্রথম মহাযুদ্ধে ইংলণ্ডের যে ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছে তার ধাক্কা সামলাতে বহু বছর লেগে যাবে এবং আর্থিক খরচ কমাবার অজুহাতে হয়ত বা বসুবিজ্ঞান মন্দিরের জন্য বরাদ্দ অর্থ

কমিয়ে দেবে। এর আগে মণ্টেগু যখন কলকাতায় ছিলেন তখন তিনি জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে পরিচিত হন। জগদীশচন্দ্র মণ্টেগুকে অনুরোধ করলেন, ভারত সরকার যেন বসুবিজ্ঞান মন্দিরের আর্থিক বরাদ্দ কমিয়ে না দেন। ইংলণ্ডের "ইণ্ডিয়া অফিসে" তিনি বক্তৃতা দিলেন। এই বক্তৃতার মাধ্যমে জগদীশচন্দ্র তাঁর গবেষণার গুরুত্ব সমবেত ভদ্রমণ্ডলীর সামনে তুলে ধরলেন। তাঁর এই বক্তৃতা ইংলণ্ডের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করল। বিভিন্ন বিজ্ঞানী এবারও জগদীশচন্দ্রের বক্তৃতার ভূয়সী প্রশংসা করল। লীড্‌স্ এবং অ্যাবর্ডিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বক্তৃতা করবার আহ্বান এল। লীড্‌স্ বিশ্ববিদ্যালয়ে তখনকার ভাইস চ্যান্সেলার ছিলেন স্যার মাইকেল স্যাড্‌লার। "স্যাড্‌লার কমিশনের" সভাপতি রূপে ইতিপূর্বে তিনি ভারত পরিদর্শন করে গেছেন। তিনিই ব্যক্তিগত উদ্যোগ নিয়ে জগদীশচন্দ্রের বক্তৃতার ব্যবস্থা করেন লীড্‌স্ বিশ্ববিদ্যালয়ে। অ্যাবর্ডিন বিশ্ববিদ্যালয় জগদীশচন্দ্রকে সম্মানসূচক "এল. এল. ডি" উপাধিতে ভূষিত করল।

এবারের ইংলণ্ড যাত্রার পাঁচ বছর আগে রয়াল ইনস্টিটিউশনের অধ্যাপক র‍্যালে এবং অধ্যাপক ভাইন্‌স্ জগদীশচন্দ্রকে এফ. আর. এস. মনোনীত করবার জন্য চেষ্টা করেছিলেন। তখন তাঁদের সেই চেষ্টা সফল হয়নি। কিন্তু এবারে ইংলণ্ডে অবস্থানকালে জগদীশচন্দ্রকে এফ. আর. এস. উপাধিতে ভূষিত করা হল।

এফ. আর. এস. মনোনীত হওয়ার পর জগদীশচন্দ্র প্রিয় ছাত্র নগেন্দ্র চন্দ্র নাগকে লিখলেন যে তাঁর বিরোধী যে জীববিজ্ঞানী একদিন তাঁর গবেষণার ফলাফল নিজের নামে প্রকাশ করেছিলেন তিনি তখনও শারীরবিজ্ঞানীগণকে তাঁর বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ করবার চেষ্টা করেছেন। সদস্য নির্বাচন পর্বটা সম্পন্ন হয় অত্যন্ত গোপনে এবং সব বিজ্ঞান শাখার মতামতের ভিত্তিতে। প্রত্যেক সদস্যই চেষ্টা করেন বিভাগীয় কর্মীকে সদস্য মনোনয়ন করতে। বিজ্ঞানের কোন বিভাগে

জগদীশচন্দ্রের স্থান সেই সম্বন্ধে এফ. আর. এস. মনোনয়ন কমিটির সদস্যরা নিশ্চিত ছিলেন না। এই ব্যাপারটা জগদীশচন্দ্রের এফ. আর. এস. মনোনীত হওয়ার পথে প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জীববিজ্ঞানী, পদার্থ-বিজ্ঞানী, এমনকি মনোবিজ্ঞানী পর্যন্ত জগদীশচন্দ্রকে এফ. আর. এস. উপাধি দেওয়ার সমর্থনে মত প্রকাশ করেছিলেন। ফলে জগদীশচন্দ্রের মনোনয়ন চূড়ান্ত হয়। সময়টা ছিল ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে মে।

ওয়ালারের বিরুদ্ধতা ঃ

জগদীশচন্দ্র রয়াল সোসাইটির ফেলো মনোনীত হন এ ব্যাপারটাতে ওয়ালারের গাত্রদাহ হল। এর আগেও জগদীশচন্দ্র যখন ইংলণ্ডে তাঁর বক্তৃতা এবং পরীক্ষা দ্বারা বিজ্ঞানীমহলে নিজের প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছিলেন তখন এই ওয়ালার নামক বিজ্ঞানী ভদ্রলোকই নানা হীন উপায়ে জগদীশচন্দ্রের কৃতিত্বকে খর্ব করতে চেষ্টা করেছিলেন। ফেলো নির্বাচিত হওয়ার পর ওয়ালার লণ্ডন টাইম্‌সে একটি চিঠি লিখে জগদীশচন্দ্রকে সরাসরি আহ্বান জানালেন জগদীশচন্দ্র যেন নিজের গবেষণাগার ছেড়ে অন্য কোথায়ও তাঁর উদ্ভাবিত "ক্রেস্কোগ্রাফ" যন্ত্রের কার্যকারিতা প্রমাণ করেন। প্রথমে জগদীশচন্দ্র ঠিক করেছিলেন ওই চিঠি উপেক্ষা করবেন। কিন্তু এর পরে পরেই ওই পত্রিকায় আরও চিঠি প্রকাশিত হতে লাগল। তখন জগদীশচন্দ্র আর চুপ করে থাকতে পারলেন না। তিনি ঠিক করলেন উপযুক্ত স্থানেই তিনি ওয়ালারের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করবেন। জগদীশচন্দ্র ইংলণ্ডের বিজ্ঞানীদের আমন্ত্রণ জানালেন লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে তাঁর পরীক্ষা দেখবার জন্য।

লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে জগদীশচন্দ্র সমবেত বিজ্ঞানীদের সামনে তাঁর ক্রেস্কোগ্রাম যন্ত্রের সংবেদনশীলতা এবং সূক্ষ্ম পরিমাপক্ষমতা প্রমাণ করলেন। ইতিপূর্বে ওয়ালার যে ইঙ্গিত করেছিলেন জগদীশচন্দ্র

কারচুপি করেছেন তাঁর ক্রেস্কোগ্রাম্ যন্ত্রের কার্যকারিতার ব্যাপারে সেই ইঙ্গিত ত প্রমাণিত হলই না বরং ওই যন্ত্রের আশ্চর্য কার্যকারিতা প্রত্যক্ষ করে উপস্থিত বিজ্ঞানীগণ বিস্মিত হয়ে গেলেন। অধ্যাপক বেলিস, অধ্যাপক ডোনান, অধ্যাপক র‍্যালে, ব্ল্যাকম্যান, ক্লার্ক, ক্লিনটন প্রভৃতি প্রখ্যাত বিজ্ঞানীগণ সমবেতভাবে টাইম্স পত্রিকায় চিঠি দিয়ে জানালেন যে তাঁরা নিজে উপস্থিত থেকে জগদীশচন্দ্রের ক্রেস্কোগ্রাফ যন্ত্রের কার্যকারিতা প্রত্যক্ষ করেছেন এবং ওই যন্ত্র সম্বন্ধে জগদীশচন্দ্র যে দাবী করেছেন তার সবটুকুই ঠিক। "নেচার" পত্রিকায় জগদীশচন্দ্রের বক্তব্যকে সমর্থন করে মন্তব্যও প্রকাশিত হল। এই ঘটনার পর কৃতী বিজ্ঞানী হিসেবে জগদীশচন্দ্রের নাম ইংলণ্ডের সব মানুষ জেনে গেল। একের পর এক বিভিন্ন জায়গা থেকে বক্তৃতা দেবার জন্য আমন্ত্রণ আসতে লাগল। ইংলণ্ড ছাড়াও প্যারিসের শারীরবিজ্ঞান কংগ্রেস থেকে জগদীশচন্দ্র আমন্ত্রণ পেলেন। এখানেও তিনি ক্রেস্কোগ্রাফের কার্যকারিতা দেখিয়ে উপস্থিত বিজ্ঞানীদের চমৎকৃত করলেন।

বসুবিজ্ঞান মন্দিরের জন্য অর্থসাহায্যের প্রচেষ্টা :

লর্ড মণ্টেগু জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞান সাধনার গুরুত্ব সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। তিনি ভারত সরকারকে এক পত্রমারফৎ অনুরোধ করলেন বসু বিজ্ঞান মন্দিরের জন্য অর্থ বরাদ্দ করতে। কিন্তু তখনকার ভারতসরকারের কর্তাব্যক্তিরা বললেন যে জগদীশচন্দ্র যে বিষয় নিয়ে গবেষণা করছেন তা অত্যন্ত দুরূহ এবং সেই গবেষণালব্ধ জ্ঞান সাধারণ মানুষের কোন উপকারে লাগবে না। কিন্তু লর্ড মণ্টেগু এই মতের সঙ্গে একমত হতে পারলেন না। তিনি যুক্তি দিয়ে ভারত সরকারকে লিখলেন জগদীশচন্দ্র ইতিমধ্যেই বিশ্বের দরবারে নিজেকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁর গবেষণালব্ধ জ্ঞানের আবেদন বিশ্বজনীন। এই পরিপ্রেক্ষিতে বসুবিজ্ঞান

মন্দিরকে সাহায্য করলে বিশ্বমানবের কল্যাণ সাধিত হবে। এই চিঠির পর ভারত সরকার বসুবিজ্ঞান মন্দিরের জন্য বার্ষিক এক লক্ষ টাকা অনুদান মঞ্জুর করেন।

কিন্তু বসুবিজ্ঞান মন্দিরে ইতিমধ্যে যে কর্মযজ্ঞ শুরু হয়েছিল তার ধারা বজায় রাখতে হলে আরও অর্থের প্রয়োজন। এইবার দেশবাসী এগিয়ে এল আর্থিক সাহায্য নিয়ে, বিজ্ঞানমন্দিরে ধারাবাহিক বক্তৃতা দেবার ব্যবস্থা চালু করা হল। সেই বক্তৃতা শুনবার জন্য আগ্রহী ব্যক্তিদের জন্য টিকিটের মূল্য ধার্য হল চব্বিশ টাকা, বার টাকা, আট টাকা এবং চার টাকা। সেযুগে এই অর্থের মূল্য অধিক হলেও কোন টিকিটই অবিক্রীত থাকল না। আজীবন সদস্য পদ সৃষ্টি করে ওই পদের জন্য মোটা টাকা চাঁদা হিসেবে সংগৃহীত হল। জগদীশচন্দ্র যে যে বিষয়ের ওপর ধারাবাহিক বক্তৃতা দিতেন তাঁর মধ্যে "লাইফ আনভয়েচ্ড", "ইনভিজিব্ল লাইট", "ইউনিভার্সাল সেনসিটিভ্নেস্ অফ্ ম্যাটার", "ফটোডাইনামিক্স্", "ইলেকট্রিক রেসপণ্ড অফ্ প্ল্যাণ্ট্স্" প্রভৃতি বিষয় উল্লেখযোগ্য।

বম্বে এবং জম্মু শহরে বক্তৃতা দিয়েও জগদীশচন্দ্র বসু বিজ্ঞান মন্দিরের জন্য অর্থ সংগ্রহ করেন। বম্বেতে রয়াল অপেরা হাউসে তিনি বক্তৃতা দিলেন "ইনভিজিবল লাইটের" উপর। সেই বক্তৃতা থেকে সংগৃহীত হল পঞ্চাশ হাজার টাকা। এছাড়া বাংলাদেশ এবং ভারতের অন্যান্য প্রদেশের শিল্পপতি ও তৎকালীন জমিদাররা বসু বিজ্ঞান মন্দিরের জন্য বিপুলভাবে অর্থ সাহায্য করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন মহারাজা মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী, মহারাজা গায়কোয়াড়, শিল্পপতি বোনামজি প্রভৃতি।

বাংলার তৎকালীন মুখ্যসচিব ছিলেন মিঃ পি. সি. লায়ন। তিনি ছিলেন একজন দুর্ধর্ষ ইংরেজ সিভিলিয়ান। এই ভদ্রলোক জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে ব্যক্তিগত উদ্যোগে সাক্ষাৎ করে জানালেন যে চাকুরি জীবনে তিনি বাংলার মানুষের অনেক ক্ষতি করেছেন।

সেইজন্য তিনি অনুতপ্ত। আজ যখন তার চাকুরি জীবন থেকে অবসর নেবার সময় এসেছে তখন তিনি নিজের কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত করতে চান। সুতরাং জগদীশচন্দ্র যদি অনুমতি দেন তবে তিনি বিজ্ঞান মন্দিরের কিছু উপকার করতে পারেন। জগদীশচন্দ্র মিঃ লায়নকে বলেন যে বসু বিজ্ঞান মন্দিরের উত্তর প্রান্তে যে একটি বস্তি আছে তা মন্দিরের সম্প্রসারণ কাজে লাগবে। মিঃ লায়ন যদি এই জমিটা বসু বিজ্ঞান মন্দিরকে পাইয়ে দিতে পারেন তবে খুব ভাল হয়। মিঃ লায়ন অবসর গ্রহণের আগেই এই জমিটা বসু বিজ্ঞান মন্দিরের হাতে অর্পণ করেছিলেন।

সপ্তম বারের জন্য ইউরোপ যাত্রা ঃ

১৯২৬ খ্রীস্টাব্দ। জগদীশচন্দ্রের বয়স এখন ৬৭ বৎসর। এই বয়সেও জগদীশচন্দ্র বিজ্ঞানের জয়যাত্রায় বেড়িয়ে পড়লেন ইউরোপ ভ্রমণে। ইউরোপ গিয়ে প্রথমে আমন্ত্রণ পেলেন লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। তারপর আমন্ত্রণ এল রয়াল সোসাইটি অফ মেডিসিন থেকে। অক্সফোর্ডের বৃটিশ অ্যাসোসিয়েশনও আমন্ত্রণ জানাল তাদের সভায় বক্তৃতা করবার জন্য। জগদীশচন্দ্র এদের সকলের আমন্ত্রণ সাদরে গ্রহণ করলেন। প্রতিটি সভায় তিনি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ আত্মপ্রত্যয় সহকারে নিজের বক্তব্য স্থাপন করলেন এবং পরীক্ষা দ্বারা তা প্রমাণও করলেন। প্রতিটি সভায় বিশেষ জ্ঞানী-গুণীজনের সমাবেশ হয়েছিল এবং বক্তৃতা শেষে তাঁরা জগদীশচন্দ্রের আশ্চর্য বিজ্ঞান-প্রতিভা প্রত্যক্ষ করে বিস্মিত হয়েছিলেন। ইংলণ্ডে জগদীশচন্দ্র যে বক্তৃতা করেন সেই ব্যাপারে লণ্ডনের এক সংবাদপত্রের প্রতিবেদন ছিল এইরকম "বৃটিশ অ্যাসোসিয়েশনের বিজ্ঞান বিভাগের একটি সভায় আচার্য বসু বক্তৃতা দেন। সভায় বহু লোক সমবেত হয়েছিল। যুবরাজ এই সভায় যোগদান করেছিলেন।

ঐ সভায় ভারতের বিজ্ঞানবিদ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু যে বিষয়ে

বক্তৃতা দিয়েছেন এবং হাতে কলমে প্রমাণ করেছেন, তা দেখে সকলেই আশ্চর্যান্বিত হন। আজ পর্যন্ত বৈজ্ঞানিকরা বিশ্বাস করে এসেছেন যে উদ্ভিদ জগতের জীবন-প্রণালী প্রাণিজগতের জীবন-প্রণালী থেকে ভিন্ন—একটি সর্বদাই নিশ্চেষ্ট এবং অপরটি সর্বদাই সক্রিয়। বাহ্য-দৃষ্টিতে এই উভয়ের মধ্যে যে সাদৃশ্য আছে, তা মনে হয় না।

কলকাতায় বসু বিজ্ঞান মন্দিরে গবেষণা করে আচার্য জগদীশচন্দ্র এই বিষয়ে ক্রমাগত দীর্ঘকাল পরীক্ষার পর স্থির করেছেন যে এই মত যথার্থ নয়। ফলে পৃথিবীর সর্বত্র একটা সাড়া পড়ে গেছে। তিনি বলেন যে উদ্ভিদেরও হৃদয় আছে এবং তিনি স্পষ্টভাবে হৃদস্পন্দন লিপিবদ্ধ করতে পারেন এবং উত্তেজক ও অবসাদক ওষুধ প্রয়োগ করে হৃদপিণ্ডের কার্যের তারতম্য রেকর্ড করতে পারেন।

ঐ সভাতে আচার্য জগদীশচন্দ্র অতি সূক্ষ্ম যন্ত্র দ্বারা স্পন্দনকারী উদ্ভিদে ওষুধ প্রয়োগে যে প্রতিক্রিয়া হয় তা প্রদর্শন করেন।

মানুষের শরীরে রক্ত যেভাবে সঞ্চালিত হয়, বৃক্ষদেহেও রস সেই ভাবেই যে পরিচালিত হয়, তা দেখাবার জন্য আচার্য জগদীশচন্দ্র একটি মৃতপ্রায় গাঁদা গাছ ইথারের মধ্যে স্থাপন করলেন এবং অপর একটি মৃতপ্রায় গাঁদা গাছ মারাত্মক বিষের মধ্যে স্থাপন করলেন। প্রথম গাছটি পুনর্জীবিত হতে লাগল, আর দ্বিতীয়টি ক্রমে ক্রমে অবসন্ন হয়ে মরে গেল।

এরপর একটি ছোট চারাগাছ বাঁচবার জন্য যে বিপুল সংগ্রাম করেছিল তা প্রদর্শন করায় শ্রোতৃবৃন্দ গভীরভাবে বিস্মিত হন। একটি অন্ধকার ঘরে ঐ চারাগাছের নাড়ীর একটি প্রতিচ্ছবি প্রাচীর গাত্রে আলোকচিহ্ন দ্বারা প্রদর্শন করা হয়। ঐ চারাগাছটির মধ্যে বিষ প্রয়োগ করা হল। আলোকবিন্দু বামদিকে অর্থাৎ মৃত্যুর দিকে সরে গেল। তারপর যখন ঐ চারাগাছটি মৃতপ্রায় হল, তখন তাকে ইথারের মধ্যে স্থাপন করা হল। এক মিনিট পরেই আলোকবিন্দু স্থির হল। তার জীবন-মৃত্যুর সংগ্রাম শুরু হল। তারপর ঐ

আলোকবিন্দু দক্ষিণ দিকে অর্থাৎ জীবনের দিকে সরে গেল। দক্ষিণের দিকে যখন আলোকবিন্দু সরতে লাগল তখন সভায় বিপুল হর্ষধ্বনি উত্থিত হল।

উপস্থিত পণ্ডিতমণ্ডলী আচার্য জগদীশচন্দ্রের অপূর্ব গবেষণা শুনে এবং তাঁর যন্ত্রের অসাধারণ সূক্ষ্মতা দেখে তাঁর প্রভূত প্রশংসা করেন এবং বেতার সহযোগে এই প্রশংসা বার্তা পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। তাঁরা একবাক্যে বলেন যে জগদীশচন্দ্র যা করেছেন তারজন্য ভারতবর্ষ বিজ্ঞান জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে এবং কলকাতার বসু বিজ্ঞান মন্দির জগতে বৈজ্ঞানিকদের একটি তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হবে।

সপ্ততিতম জন্মজয়ন্তী ঃ

১৯২৮ খ্রীস্টাব্দের ৩০শে নভেম্বর জগদীশচন্দ্রের সত্তর বছর পূর্ণ হল। পরদিন পয়লা ডিসেম্বর দেশবাসী উৎসাহ এবং উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে জগদীশচন্দ্রের জন্মজয়ন্তী উৎসব পালন করতে উদ্যোগী হলেন। উদ্যোক্তাদের মধ্যে সব থেকে বেশী উৎসাহী ছিলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। জন্মজয়ন্তী পালনের আয়োজন করা হল বসু বিজ্ঞান মন্দিরেই। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিজ্ঞানী, দার্শনিক এবং অন্যান্য শাখার প্রখ্যাত ব্যক্তিগণের কাছ থেকে অভিনন্দন বার্তা এসে পৌঁছাতে লাগল। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই উপলক্ষে একটি লিখলেন—

"শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু
প্রিয় কর কমলেষু—
বন্ধু,

যেদিন ধরণী ছিল ব্যথাহীন বাণীহীন মরু,
প্রাণের আনন্দ নিয়ে, শঙ্কা নিয়ে, দুঃখ নিয়ে, তরু
দেখা দিল দারুণ নির্জনে। কত যুগ যুগান্তরে
কান পেতে ছিল স্তব্ধ মানুষের পদ শব্দ তরে

নিবিড় গহন তলে। সবে এল মানব অতিথি,
দিল তারে ফুলফল, বিস্তারিয়া দিল ছায়াবীথি।
প্রাণের আদিম ভাষা গূঢ় ছিল তাহার অন্তরে
সম্পূর্ণ হয়নি ব্যক্ত আন্দোলনে, ইঙ্গিতে, মর্মরে।
তার দিন রজনীর জীবযাত্রা বিশ্বধরাতলে
চলেছিল নানা পথে শব্দহীন নিত্য কোলাহলে
সীমাহীন ভবিষ্যতে; আলোকের আঘাতে তনুতে
প্রতিদিন উঠিয়াছে চঞ্চলিত অণুতে অণুতে
স্পন্দবেগে নিঃশব্দ ঝঙ্কারগীতি; নীরব স্তবনে
সূর্যের বন্দনা গান গাহিয়াছে প্রভাত পবনে।
প্রাণের প্রথম বাণী এই মত জাগে চারিভিতে
তৃণে তৃণে বনে বনে, তবু তাহা রয়েছে নিভৃতে,
কাছে থেকে শুনি নাই; হে তপস্বী, তুমি একমনা
নিঃশব্দেরে বাক্য দিলে; অরণ্যের অন্তর বেদনা
শুনেছ একান্তে বসি; মূক জীবনের সে ক্রন্দন
ধরণীর মাতৃবক্ষে নিরন্তর জাগাল স্পন্দন
অঙ্কুরে অঙ্কুরে উঠি, প্রসারিয়া শত ব্যগ্রশাখা,
পত্রে পত্রে চঞ্চলিয়া, শিকড়ে শিকড়ে আঁকাবাঁকা
জন্ম মরণের দ্বন্দ্বে, তাহার রহস্য তব কাছে
বিচিত্র অক্ষর রূপে সহসা প্রকাশ লভিয়াছে।
প্রাণের আগ্রহবার্তা, নির্বাকের অন্তঃপুর হ'তে,
অন্ধকার পার করি আনি দিলে দৃষ্টির আলোতে।
তোমার প্রতিভাদীপ্ত চিত্ত মাঝে কহে আজি কথা
তরুর মর্মের সাথে মানব মর্মের আত্মীয়তা;
প্রাচীন আদিমতম সম্বন্ধের দেয় পরিচয়।
হে সাধক শ্রেষ্ঠ, তব দুঃসাধ্য সাধন লভে জয়;

সতর্ক দেবতা সেথা গুপ্তবাণী রেখেছেন ঢাকি
সেথা তুমি দীপহস্তে অন্ধকারে পশিলে একাকী
জাগ্রত করিতে তারে। দেবতা আপন পরাভবে
যেদিন প্রসন্ন হন, সেদিন উদার জয় রবে
ধ্বনিত অমরাবতী আনন্দে রচিয়া দেয় বেদী
বীর বিজয়ীর তরে, যশের পতাকা অভ্রভেদী
মর্ত্যের চূড়ায় উড়ে।
মনে আছে একদা সেদিন
আসন প্রচ্ছন্ন তব, অশ্রদ্ধার অন্ধকারে লীন,
ঈর্ষা কণ্টকিত পথে চলেছিলে ব্যথিত চরণে,
ক্ষুদ্র শত্রুতার সাথে প্রতিক্ষণে অকারণ রণে
হয়েছ পীড়িত শ্রান্ত। সেই দুঃখই তোমার পাথেয়,
সে অগ্নি জ্বেলেছে যাত্রা দীপ, অবজ্ঞা দিয়েছে শ্রেয়,
পেয়েছ সম্বল তব আপনার গভীর অন্তরে।
তোমার খ্যাতির শঙ্খ আজি বাজে দিকে দিগন্তরে
সমুদ্রের একূলে ওকূলে ; আপন দীপ্তিতে আজি
বন্ধু, তুমি দীপ্যমান ; উচ্ছ্বসি উঠিছে বাজি
বিপুল কীর্তির মন্ত্র তোমার আপন কর্মমাঝে।
জ্যোতিষ্ক সভার তলে সেথা তব আসন বিরাজে
সেথায় সহস্র দীপ জ্বলে আজি দীপালি উৎসবে !
আমারো একটি দীপ তারি সাথে মিলাইনু যবে
চেয়ে দেখো তার পানে, এ দীপ বন্ধুর হাতে জ্বালা ;
তোমার তপস্যা ক্ষেত্র ছিল সবে নিভৃত নিরালা
বাধায় বেষ্টিত রুদ্ধ, সেদিন সংশয় সন্ধ্যাকালে
কবি হাতে বরমাল্য সে বন্ধু পরায়েছিল ভালে ;
অপেক্ষা করেনি সে তো জনতার সমর্থন তরে,
দুর্দিনে জ্বেলেছে দীপ রিক্ত তব অর্ঘ্যথালি পরে।

আজি সহস্রের সাথে ঘোষিল সে, ধন্য ধন্য তুমি,
ধন্য তব বন্ধুজন, ধন্য তব পুণ্য জন্মভূমি।"

জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে অধ্যাপক মোলিশ বসুবিজ্ঞান মন্দিরে উপস্থিত ছিলেন। অধ্যাপক মোলিশ জগদীশচন্দ্রকে সম্বর্ধিত করে বললেন যে, তিনি বসুবিজ্ঞান মন্দিরে আজ উপস্থিত হয়েছেন পাশ্চাত্যের প্রতিনিধিরূপে জগদীশচন্দ্রকে অভিনন্দন জানাতে। পাশ্চাত্য এবং প্রাচ্যের মধ্যে মানসিক সহযোগিতার বন্ধন সুদৃঢ় করবার জন্য পাশ্চাত্য থেকে তিনিই প্রথমে এই বিজ্ঞান মন্দিরে উপস্থিত থাকতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছেন। মনীষী ঐতিহাসিক রমাঁ রলাঁ জগদীশ-চন্দ্রকে অভিনন্দিত করে চিঠি লিখলেন যে, জগদীশচন্দ্রের সপ্ততিতম জন্মজয়ন্তী উৎসবের জন্য যাঁরা উদ্যোগ নিয়েছেন তিনি নিজেকে তাঁদের দলে অন্তর্ভুক্ত করতে ইচ্ছুক। রমাঁ রলাঁ নিজের তরফ থেকে এবং ফ্রান্সে জগদীশচন্দ্রের সমস্ত বন্ধুবর্গের তরফ থেকে জগদীশচন্দ্রকে অন্তরের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন। রমাঁ রলাঁ আরও লিখলেন যে জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক প্রতিভা বিচার করবার ক্ষমতা তাঁর নেই, তিনি শুধু অভিনন্দন জানাচ্ছেন সেই সত্যদ্রষ্টা ঋষিকে যিনি তাঁর দার্শনিক দৃষ্টি দিয়ে বৃক্ষ ও পাষাণের আড়ালে লুকিয়ে থাকা প্রাণ-কণিকার সন্ধান পেয়েছেন।

প্রখ্যাত পদার্থবিদ সোমারফেল্ড লিখে পাঠালেন, আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন। রবীন্দ্রনাথ যেমন ভারতীয় ললিতকলার প্রবীণতম প্রতিনিধি, প্রসার্যমান ভারতীয় বিজ্ঞানে আপনার পরিচয়ও তেমনই। আপনিই ভারতবর্ষে বহু শাখা-সমন্বিত আধুনিক বিজ্ঞানের সূচনা করেছেন এবং তার অনুশীলনে ভারতীয় সূচকগণকে দীক্ষিত করেছেন। খুবই আনন্দের কথা বর্তমানে ভারতবর্ষে যাঁরা পদার্থবিদ্ রূপে খ্যাতিলাভ করেছেন তাঁদের অধিকাংশই আপনার শিষ্য।

অন্তিম কয়েকটি বছর ঃ

১৯২৯ খ্রীস্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে জগদীশচন্দ্র দশম বৈজ্ঞানিক অভিযানে ইউরোপ যাত্রা করেন। এই সময় ইণ্ডিয়া অফিসে তিনি উপস্থিত বৈজ্ঞানিকগণের সামনে উদ্ভিদের নির্বাক জীবনের অভিব্যক্তি সম্বন্ধে বক্তব্য রাখলেন। তদানীন্তন ভারত সচিব ওয়েজউড বেন জগদীশচন্দ্রের বক্তৃতা কালে উপস্থিত ছিলেন। বক্তৃতা শেষে বেন উচ্ছ্বসিত ভাষায় জগদীশচন্দ্রকে অভিনন্দিত করলেন। পরের দিন ইংলণ্ডের প্রভাতী সংবাদপত্রগুলোতে যে প্রতিবেদন বার হল তাতেও বেনের মনোভাবেরই প্রতিফলন দেখা গেল।

জগদীশচন্দ্র শেষবারের জন্য ইউরোপে যান ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দে। এই যাত্রায় জেনিভায় ইনটেলেক্‌চুয়াল কো-অপারেশন সমিতির অধিবেশনে জগদীশচন্দ্র পরিচিত হন বিশ্বখ্যাত বৈজ্ঞানিক মাদাম ক্যুরির সঙ্গে। তখন তাঁর পরিণত বয়স। শারীরিক পরিশ্রম করতে কিছুটা ক্লান্তিবোধ করতেন। ফলে এর পর থেকে কাজকর্ম কিছুটা শিথিল করে দিলেন।

১৯৩১ খ্রীস্টাব্দের ১৪ই এপ্রিল জগদীশচন্দ্রের জীবনে অন্যতম স্মরণীয় দিন। এই দিন কলকাতা পৌরপ্রতিষ্ঠান দেশবাসীর তরফ থেকে জগদীশচন্দ্রকে নাগরিক সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করলেন। ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দেই গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সপ্ততিতম জন্মজয়ন্তী পালিত হল। গুরুদেবের ওই জন্মদিন পালন করবার জন্য যে কমিটি হল তার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন স্বয়ং জগদীশচন্দ্র। এই উপলক্ষে "দি গোল্ডেন বুক অফ টেগোর" নামে যে বইটি প্রকাশিত হয় তাঁরও প্রধান দায়িত্বে ছিলেন জগদীশচন্দ্র।

এই সময়েই জগদীশচন্দ্র মানসিক উদ্বেগের মধ্যে পড়ে গেলেন। ভারত সরকার বসুবিজ্ঞান মন্দিরের জন্য বার্ষিক বরাদ্দ এক লক্ষ টাকা থেকে কমিয়ে তিপ্পান্ন হাজার করে দিলেন। ফলে বসুবিজ্ঞান মন্দিরকে ব্যয়সঙ্কোচন করে চলতে হল। জগদীশচন্দ্র দৃঢ় মনোবল এবং অসম্ভব আত্মপ্রত্যয় দ্বারা এই বাধাও কাটিয়ে উঠলেন।

শেষের কয়েকটি বছর জগদীশচন্দ্রের শরীর ভাল যাচ্ছিল না। বহুমূত্র এবং উচ্চ রক্তচাপজনিত রোগ তাঁর স্বাস্থ্যকে হীনবল করে দিতে লাগল। এই সময় ডাক্তারদের পরামর্শক্রমে জগদীশচন্দ্র নানা জায়গায় ভ্রমণ করতে যেতেন স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য। এইসব জায়গার মধ্যে দার্জিলিং-এর "মায়াপুরী", কলকাতার অদূরে ফলতা ইত্যাদি উল্লেখ করতে হয়। স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য জগদীশচন্দ্র কখনও কখনও গিরিডিতে যেতেন। ডাঃ নীলরতন সরকার এবারও জগদীশচন্দ্রকে পরামর্শ দিলেন গিরিডিতে গিয়ে কিছুদিন থেকে আসতে। লেডি অবলা বসুকে সঙ্গে নিয়ে জগদীশচন্দ্র গিরিডি গেলেন। সঙ্গে গেলেন বসুবিজ্ঞান মন্দিরের সেক্রেটারী অবনীনাথ মিত্র। জগদীশচন্দ্রের মত ব্যস্ত মানুষ কখনও কাজ ছাড়া থাকতে পারতেন না। এবারও সঙ্গে দরকারী কাগজপত্র নিলেন। গিরিডিতে গিয়ে উঠলেন এক রায় বাহাদুরের বাড়ীতে। এবারের যাত্রার সঙ্গে গিয়েছিলেন একজন চিকিৎসক। সম্পর্কে তিনি ডাঃ নীলরতন সরকারের ভ্রাতুষ্পুত্র। এই চিকিৎসক সপ্তাহান্তে একবার কলকাতায় যেতেন এবং জগদীশচন্দ্রের স্বাস্থ্যের সর্বশেষ পরিস্থিতির বিষয়ে ডাঃ নীলরতন সরকারকে অবহিত করতেন। গিরিডির এক স্থানীয় ডাক্তারও নিয়মিত জগদীশচন্দ্রের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে যেতেন। জগদীশচন্দ্রের তখন ইনসুলিন ইন্‌জেকশন নিতে হত। স্থানীয় ডাক্তার জগদীশচন্দ্রকে নিয়মিত ইন্‌সুলিন ইন্‌জেকশন দিতেন।

এদিকে লেডি বসু সেবা দিয়ে, যত্ন দিয়ে জগদীশচন্দ্রের শারীরিক কষ্ট লাঘব করার চেষ্টা করে যেতে লাগলেন। রায়বাহাদুরের বাড়ীর লোকজনও সাধ্যমত জগদীশচন্দ্রের সেবা করতে লাগলেন। একদিন ডাঃ নীলরতন সরকার এলেন কলকাতা থেকে। তিনি পরামর্শ দিলেন রক্তচাপ নিয়মিত পরীক্ষা করা দরকার। আচার্যদেবের চিকিৎসার কোন ত্রুটি যাতে না হয় সেইরকম ব্যবস্থা হল।

অসুস্থতার মধ্যেও দেশের কল্যাণের কথা জগদীশচন্দ্রের মন জুড়ে

থাকে। যেসব দর্শনপ্রার্থী আসেন তাঁদের সঙ্গে জগদীশচন্দ্র দেশের নানা সমস্যার কথা আলোচনা করেন। কি করলে সেইসব সমস্যার সমাধান হবে তা নিয়েও দর্শনার্থীদের সঙ্গে আলোচনা করেন। গিরিডি থেকেই বসুবিজ্ঞান মন্দিরের খোঁজ-খবর নেন। কোন্ কোন্ ছাত্র কি কি বিষয়ে গবেষণা করছে তাঁদের কাজের অগ্রগতিই বা কি রকম এইসব খবরও অসুস্থ জগদীশচন্দ্র নিয়মিত রাখেন। অনুজ-প্রতিম ছাত্রদের গবেষণার সাফল্যে তাঁর রোগগ্রস্ত মন উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। তাঁর মানস দর্পণে ভেসে ওঠে তাঁরই অসংখ্য ছাত্রের মুখ যারা বিজ্ঞানসাধনার দ্বারা পরাধীন ভারতের মুখোজ্জ্বল করবে। ভারত আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করবে।

অবশেষে এল সেই ২৩শে নভেম্বর, ১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দ। আর কিছুদিন বাদেই বসুবিজ্ঞান মন্দিরে জগদীশচন্দ্রের আশি বছর পূর্তির জন্মজয়ন্তী পালিত হবে। তার তোড়জোড়ও শুরু হয়ে গেছে। জগদীশচন্দ্রও মানসিকভাবে তৈরি হচ্ছেন কলকাতায় ফিরে যাবার জন্য। তখন সকালে চায়ের সময়। রায়বাহাদুরের বাড়ীতে সকলে চায়ের টেবিলে অপেক্ষা করছেন জগদীশচন্দ্রের জন্য। কিছুক্ষণ আগেই জগদীশচন্দ্র বাথরুমে ঢুকেছেন। বাথরুম থেকে ফিরে এলেই চা পর্ব শেষ হবে। কিন্তু আজ যেন আচার্যদেব অস্বাভাবিক দেরি করছেন। লেডি বসুর প্রাণ কেঁপে উঠল। তিনি আর অপেক্ষা করতে পারলেন না। বাইরে থেকে বাথরুমের দরজায় আঘাত করতেই বাথরুমের দরজা খুলে গেল। লেডি বসু দেখলেন বাথরুমের মধ্যে আচার্যদেবের অচৈতন্য দেহ মেঝেয় পড়ে আছে। তিনি আর্তনাদ করে উঠলেন। তাঁর হৃদয়বিদারী আর্তনাদ শুনে সকলে ছুটে এল। সকলে ধরাধরি করে আচার্যদেবের সংজ্ঞাহীন দেহ বাইরে নিয়ে এলেন। সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারকে খবর দেওয়া হল। তিনি এসে আচার্যদেবের চেতনা ফিরিয়ে আনার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করলেন। কিন্তু সকলের সব চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে ভারতের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী ও মানবতার মূর্ত প্রতীক

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু চিরদিনের জন্য ইহলোক ত্যাগ করলেন। বাংলাদেশ তথা সমগ্র ভারতবর্ষ শোকে মূহ্যমাণ হয়ে পড়ল।

পরদিন ২৪শে নভেম্বর গিরিডি থেকে আচার্যদেবের মরদেহ কলকাতায় নিয়ে আসা হল। বসুবিজ্ঞান মন্দিরের প্রতিটি কর্মী শোকে স্তব্ধ হয়ে পড়ল। তাঁরা আপনজন হারাবার ব্যথা অনুভব করল। আচার্যদেবের মরদেহ নিয়ে এক বিশাল শোকযাত্রা বার হল। স্মরণাতীত কালের মধ্যে এত বড় শোকযাত্রা কলকাতার মানুষ প্রত্যক্ষ করেনি।

স্বদেশ প্রেমিক জগদীশচন্দ্র ঃ

জগদীশচন্দ্রের জীবন-ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় দেশের প্রতি জগদীশচন্দ্রের ছিল অকৃত্রিম ভালবাসা। পরাধীন ভারতের খ্যাতিমান রাজকর্মচারী ছিলেন তাঁর পিতা। কিন্তু জগদীশচন্দ্রের জীবনের ওপর ইংরেজ সংস্কৃতি ও সভ্যতা কোন প্রভাবই ফেলতে পারেনি। দেশের জনসাধারণকে তিনি পরমাত্মীয় মনে করতেন। কর্মসূত্রে জগদীশচন্দ্রকে বেশীর ভাগ সময় ইংরেজ উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের সঙ্গে সময় কাটাতে হত। এতে অনেক সময় আপাতদৃষ্টিতে মনে হত জগদীশচন্দ্র বুঝি বিদেশী শাসকবর্গের অনুরক্ত। কিন্তু আসল ঘটনা ছিল এর বিপরীত। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের স্মৃতি রক্ষার ব্যাপারে তিনি সক্রিয় উদ্যোগ নিয়েছিলেন। কারণ জগদীশচন্দ্র মনে করতেন "...তাঁর সম্মানার্থে যদি একটি যোগ্য স্মারক স্থাপন করা হয়, তবে দেশবাসীর মানসলোকে তাঁর আত্মোৎসর্গের কাহিনী চিরজাগ্রত থাকবে। আমি প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবনের জন্যে সর্বতোমুখী কর্মধারার একজন উৎসাহী সমর্থক। আমি নিজে আন্তরিক নিষ্ঠার সঙ্গে সে কর্মধারার অঙ্গীভূত একটি মাত্র পথ অনুসরণ করে চলেছি, সে হল জ্ঞান-বিস্তারের পথ। আমি দীর্ঘ দিন ধরে সে বিষয়ে চিন্তা ও অনুশীলন করেছি, তার

বাইরে অন্য কোন ভূমিকায় জনসাধারণের সামনে আত্মপ্রকাশ করব না—এই আমার ব্যক্তিগত মনোভাব।" গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন জগদীশচন্দ্রের সুহৃদ এবং মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। তাঁর একটি লেখায় তিনি জগদীশচন্দ্রের দেশপ্রীতির প্রশংসা করেছেন। ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দে বিক্রমপুর সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে জগদীশচন্দ্র বললেন—"কোন দিন কি আমাদের দেশে প্রকৃত বৈজ্ঞানিকের সংখ্যা বর্ধিত হইবে না, যাঁহারা কেবল শ্রুতিধর না হইয়া স্বীয় চিন্তাবলে উদ্ভাবন ও আবিষ্কার করিতে পারিবেন ?"

বিদেশ থেকে বন্ধু রবীন্দ্রনাথকে তিনি মাঝে মধ্যে চিঠি দিতেন। সেই চিঠির একটিতে জগদীশচন্দ্র লিখলেন—"তোমাদের উৎসাহবাণীতে মাতৃস্বর শুনিলাম। তোমাদের পশ্চাতে আমি এক দীনা চীরবসন পরিহিতা মূর্তি সর্বদা দেখিতে পাই। তোমাদের সহিত আমি তাঁহার অঞ্চলে আশ্রয় লই। সাধারণত লোকের যেসব বন্ধন থাকে, তাহা হইতে আমি মুক্ত। কিন্তু আমি সেই অঞ্চলডোর ছেদন করিতে পারি না।" আর এক জায়গায় জগদীশচন্দ্র লিখছেন—"গাছ মাটি হইতে রস শোষণ করিয়া বাড়িতে থাকে ; উত্তাপ ও আলো পাইয়া পুষ্পিত হয়। আমার মাতৃভূমির রসে আমি জীবিত, আমার স্বজাতির প্রেমালোকে আমি প্রস্ফুটিত"। এই উক্তি থেকেই দেশের প্রতি জগদীশচন্দ্রের অকপট ভালবাসা ও অনুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়।

১৯০৫ খ্রীস্টাব্দ বাংলার ইতিহাসের এক স্মরণীয় বছর। কারণ ঐ বছর স্বদেশী আন্দোলনের ঢেউয়ে বাংলার এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত উত্তাল হয়েছিল। ঐ বছর থেকেই পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য বিপ্লবী আন্দোলনের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। ঋষি অরবিন্দ, ভগিনী নিবেদিতা, বিপিনচন্দ্র পাল, আনন্দমোহন প্রভৃতি জাতীয় নেতারা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ার উদ্যোগ নিচ্ছেন। এঁরা সকলেই ছিলেন জগদীশচন্দ্রের অত্যন্ত কাছের মানুষ। তবুও জগদীশচন্দ্র সক্রিয় রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করেননি। কারণ গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের মত তিনিও

বিশ্বাস করতেন যে পূর্ণ স্বরাজের উপযুক্ত করে নিজেদের গড়ে তুলতে হবে। বিজ্ঞানে, শিল্পে, সাহিত্যে জাতি যদি বিশ্বের দরবারে স্বকীয় শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ রাখতে পারে তবে স্বরাজলাভ অনেক সহজতর হবে। জগদীশচন্দ্র রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ না করলেও দেশের মুক্তিযোদ্ধাদের শ্রদ্ধা করতেন। ইংরেজদের চোখে ধূলো দেবার জন্য শ্রীঅরবিন্দকে পণ্ডিচেরীতে পাঠিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন দেখা দিল। কিন্তু বিপ্লবীদের হাতে তখন পর্যাপ্ত অর্থ না থাকায় জাহাজের ভাড়া সংগ্রহের ব্যাপারে সমস্যা দেখা দিল। তখন ওই জাহাজ ভাড়ার টাকাটা জগদীশচন্দ্রই জুগিয়েছিলেন। বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ মানবসেবার মাধ্যমে দেশ সেবা করে গেছেন। জগদীশচন্দ্রও বিজ্ঞানচর্চা ও গবেষণার পথে দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করেছেন, তাঁদের আত্মপ্রত্যয়ী করে তুলেছেন। বিদেশী সরকার নানাভাবে জগদীশচন্দ্রকে হেনস্থা করার চেষ্টা করেছিল। কর্মজীবনে তাঁর প্রাপ্য মর্যাদা দিতে তারা বার বার কুণ্ঠা বোধ করেছে। তখন জগদীশচন্দ্র তাদের অবিচার এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন এবং ইংরেজ সরকারকে বাধ্য করেছেন তাঁর হৃত সম্মান ফিরিয়ে দিতে। জগদীশ-চন্দ্রের কর্মজীবনের শুরুতে তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপক হয়ে ঢুকলেন। জগদীশচন্দ্রকে বলা হল তাঁর বেতন হবে সমপদাধিকারী ইংরেজ অধ্যাপকদের বেতনের এক-তৃতীয়াংশ। জগদীশচন্দ্র এই অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন। তিনি বেতন প্রত্যাখ্যান করলেন। তিন বছর যাবৎ জগদীশচন্দ্র বিনা বেতনে অধ্যাপনা করে গেলেন। অবশেষে ইংরেজদের টনক নড়ল। তারা বেতন বৈষম্য তুলে দিলেন। জগদীশচন্দ্র অন্যান্য ইংরেজ অধ্যাপকদের বেতনের হারেই মাসিক বেতন পেলেন।

জগদীশচন্দ্র ছিলেন স্বাধীনচেতা ব্যক্তিত্ব। নিজে যা ভাল মনে করতেন শত চাপে তার থেকে সরে আসতেন না। জগদীশচন্দ্র ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকার মনোনীত সিনেট সদস্য।

একবার সিনেটের সভায় কোন এক ব্যাপারে জগদীশচন্দ্র কোন প্রস্তাব সমর্থন করলেন না। এতে প্রস্তাবটি সভায় পাশ হল না। ফলে সরকারের স্বার্থহানি হল। ইংরেজ সরকার জগদীশচন্দ্রের কাছে কৈফিয়ত তলব করলেন তাঁর আচরণ ব্যাখ্যা করবার জন্য। তিনি উত্তরে জানালেন সরকারের স্তাবকতা করবার জন্য তিনি সিনেটের সদস্যপদ গ্রহণ করেননি। সরকার যদি শুধু তাদের কথায় সায় দেবার জন্যই তাঁকে সিনেটের সদস্য হিসেবে মনোনীত করে থাকেন তবে অবিলম্বে তারা এই মনোনয়ন প্রত্যাহার করে নিতে পারেন।

১৯০০ খ্রীস্টাব্দে যখন জগদীশচন্দ্র ইউরোপে তাঁর গবেষণার ওপর বক্তৃতা ও পরীক্ষা দ্বারা বিজ্ঞানীমহলকে বিস্মিত করে দিচ্ছিলেন তখন ইংলণ্ডের এক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আহ্বান এল অনেক বেতনে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক পদ গ্রহণ করবার। তাঁকে বলা হল বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করলে তিনি গবেষণা করারও সব রকম সুযোগ পাবেন। কিন্তু জগদীশচন্দ্র দেশের মাটি ছেড়ে বিদেশের এই লোভনীয় পদে যোগদান করতে সম্মত হলেন না। তিনি জানালেন—"তোমাদের স্বরে আমি ক্ষীণ মাতৃস্বর শুনতে পাই—সেই মাতৃদেবী ব্যতীত আমার আর কি উপাস্য আছে? তাঁহার বরেই আমি বল পাই, আমার আর কে আছে?"

বিদেশী ইংরেজ সরকার গবেষণার কাজে প্রেসিডেন্সী কলেজের গবেষণাগার ব্যবহার করতে দিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। ভগিনী নিবেদিতা ১৮ই এপ্রিল, ১৯০৩ খ্রীস্টাব্দের একটি চিঠিতে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখলেন—"কলেজের রুটিনটি এমনভাবে তৈরি হয়েছে যাতে জগদীশচন্দ্র গবেষণা করার সময় না পান।" ত্রিপুরার মহারাজা মহিমচন্দ্র দেববর্মা লিখেছেন—"একদিন রবিবাবুর তলবে জগদীশবাবুর গৃহে উপস্থিত হইয়া জানিতে পারিলাম, প্রাইভেট কার্যে কলেজের বিজ্ঞানাগার ব্যবহার করা কর্তৃপক্ষের অভিপ্রেত নহে। রবিবাবু ইহাতে মর্মান্তিক বেদনা অনুভব করিলেন, বিশেষতঃ বুঝিলেন,

জগদীশবাবুর নিজের বিজ্ঞানাগার না হইলে তাঁহার নূতন তথ্য আবিষ্কারের পথ চিরতরে বন্ধ হইয়া যাইবে। পরামর্শ হইল ২ ,০০০ টাকা সংগ্রহ করিতে হইবে। ১০,০০০ টাকা রবিবাবু নিজে আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধবদের নিকট হইতে সংগ্রহ করিবেন, বাকি টাকার জন্য ত্রিপুরা রাজদরবারে ভিক্ষা করিতে উপস্থিত হইবেন।"

১৯১৬ খ্রীস্টাব্দে প্রেসিডেন্সী কলেজের একটি ঘটনায় সারা দেশ তখন উত্তেজিত। ওই কলেজের এক অধ্যাপক ছিলেন ওটেন। তাঁর ওটেনের অপমানজনক কথায় প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্ররা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ। ওটেনের আচরণের প্রতিবাদস্বরূপ ছাত্রসমাজ ধর্মঘটের ডাক দিয়েছেন। তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন ভারতের আর এক সুসন্তান সুভাষচন্দ্র। যখন অন্যান্য রাজকর্মচারী কোন প্রতিবাদ করতে সাহস পেলেন না তখন জগদীশচন্দ্রই এগিয়ে এলেন। তিনি সুভাষচন্দ্রকে নৈতিক সাহস জুগিয়ে বললেন, সুভাষচন্দ্র ধর্মঘট ডেকে উপযুক্ত কাজই করেছেন।

নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ছিলেন জগদীশচন্দ্রের আর একজন সুহৃদ। একবার জগদীশচন্দ্র গয়ায় বেড়াতে গিয়ে দ্বিজেন্দ্রলালের সাক্ষাৎ লাভ করেন। সেই প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন—"কয়েক বৎসর পূর্বে একবার গয়ায় বেড়াইতে গিয়াছিলাম। সেখানে দ্বিজেন্দ্রলাল আমাকে তাঁহার কয়েকটি গান শুনাইয়াছিলেন। সেদিনের কথা কখনও ভুলিব না। নিপুণ শিল্পীর হস্তে, আমাদের মাতৃভাষার কি যে অসীম ক্ষমতা সেদিন তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলাম। যে ভাষার করুণ ধ্বনি মানবের অক্ষমতা, প্রেমের অতৃপ্ত বাসনা ও নৈরাশ্যের শোক গাহিয়াছিল, সেই ভাষারই অন্য রাগিনীতে অদৃষ্টের প্রতিকূল আচরণে উপেক্ষা, মানবের শৌর্য ও মরণের আলিঙ্গণ ভিক্ষা ভৈরব নিনাদে ধ্বনিত হইল।"

"ধরণী এক্ষণে দুর্বলের ভার বহনে প্রপীড়িতা। রুদ্র সংহার মূর্তি ধারণ করিয়াছেন। বর্তমান যুগে বীর্য অপেক্ষা ভারতের উচ্চতর ধর্ম

নাই। কে মরণ-সিন্ধু মন্থন করিয়া অমরত্ব লাভ করিবে? ধর্মযুদ্ধের এই আহ্বান দ্বিজেন্দ্রলাল বজ্রধ্বনিতে ঘোষণা করিলেন।"

জগদীশচন্দ্র বন্ধু দ্বিজেন্দ্রলালকে একবার লিখলেন—"আপনি রাণাপ্রতাপ, দুর্গাদাস প্রভৃতির অনুপম চরিতগাথা বঙ্গবাসীকে শুনাইতেছেন বটে, কিন্তু তাঁহারা বাঙালীর নিজস্ব সম্পত্তি বা একেবারেই আপন ঘরের জন নহেন। এখন এমন আদর্শ বাঙালীকে দেখাইতে হইবে—যাহাতে এই মুমূর্ষু জাতটা আত্মশক্তিতে আস্থাবান হইয়া আত্মোন্নতির জন্য আগ্রহান্বিত হয়। আমাদের এই বাংলা-দেশের আবহাওয়ায় জন্মিয়া, আমাদের ভিতর দিয়াই বাড়িয়া উঠিয়া সমগ্র জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিতে পারিয়াছেন, যদি সম্ভব হয়, যদি পারেন ত একবার সেই আদর্শ এই বাঙালী জাতিকে দেখাইয়া, আবার তাহাদিগকে জিয়াইয়া-মাতাইয়া তুলুন।" এই লেখার থেকেই বোঝা যায় দেশের প্রতি, বাঙালীর প্রতি জগদীশচন্দ্রের অকৃত্রিম ভালবাসার কথা।

দেশ বলতে জগদীশচন্দ্র দেশের মানুষকে বুঝতেন। বিক্রমপুর সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে জগদীশচন্দ্র বললেন—"তুমি ও আমি যে শিক্ষালাভ করিয়া নিজেকে উন্নত করিতে পারিয়াছি এবং দেশের জন্য ভাবিবার অবকাশ পাইয়াছি, ইহা কাহার অনুগ্রহে? এই বিস্তৃত রাজ্যরক্ষার ভার প্রকৃতপক্ষে কে বহন করিতেছে? তাহা জানিতে সমৃদ্ধশালী নগর হইতে দৃষ্টি অপসারিত করিয়া দুঃস্থ পল্লীগ্রামে স্থাপন কর। সেখানে দেখিতে পাইবে পঙ্কে অর্ধনিমজ্জিত, অনশনক্লিষ্ট, রোগে শীর্ণ, অস্থিচর্মসার এই 'পতিত' শ্রেণীরাই ধন-ধান্য দ্বারা সমগ্র জাতিকে পোষণ করিতেছে। অস্থিচূর্ণ দ্বারা নাকি ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়। অস্থিচূর্ণের বোধশক্তি নাই; কিন্তু যে জীবন্ত অস্থির কথা বলিলাম, তাহার মজ্জায় চিরবেদনা নিহিত আছে।"

ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের ব্যবস্থাপনায় এককালে জগদীশচন্দ্র বিহারের কয়লাখনি অঞ্চলে শ্রমিকদের কল্যাণের জন্য অর্থসাহায্য করেন।

মনীষী ঐতিহাসিক রমাঁ রলাঁর কথায় "জাতীয় গর্ব—শুধু ভারতীয় নয়, বাঙালীর গর্ব তাঁর মধ্যে থেকে বিদ্যুতের মত ঝলসে ওঠে। বুঝতে পারা যায় যে তাঁর মনের মধ্যে আছে বাঙালী চরিত্রের তথাকথিত বীর্যহীনতা ও ভীরুতার সম্পর্কে ইংলণ্ডীয় (বিশেষ করে কিপলিঙের) রচনার দরুন নিদারুণ অপমানবোধ।"

স্বাধীনচেতা জগদীশচন্দ্র ঃ

জগদীশচন্দ্র নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কখনও কারও কাছে মাতা অবনত করেননি। তাঁর আত্মসম্মান-জ্ঞান ছিল অত্যন্ত প্রবল।

জগদীশচন্দ্র তখন সবে প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপনা করতে ঢুকেছেন। তখনকার দিনে ইংরেজরা মনে করত ভারতীয়রা বিশেষ করে বাঙালীরা শিক্ষায়-সংস্কৃতিতে অত্যন্ত ইংরেজদের থেকে অনেক নিচে। আধুনিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বাঙালীরাও যে, যে কোন উন্নত জাতির সমকক্ষ হতে পারে তা তাঁরা বিশ্বাস করত না। তাই জগদীশচন্দ্র কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ., ট্রাইপস, লণ্ডনের বি. এস-সি. হওয়া সত্ত্বেও তদানীন্তন ইংরেজ শিক্ষা-অধিকর্তা শিক্ষা-বিভাগে তাঁকে চাকরি দিতে প্রথমে সম্মত হননি। এমনকি এই ব্যাপারে ভাইসরয় রিপনের আদেশও প্রথমে শিক্ষা-অধিকর্তা মানতে রাজী হননি। অবশেষে অবশ্য ভাইসরয়ের বার বার তাগিদে জগদীশচন্দ্রকে শিক্ষা-বিভাগে চাকরি দেওয়া হল। কিন্তু বলা হল তাঁর সমমর্যাদায় নিযুক্ত ইংরেজ অধ্যাপকদের বেতনের মাত্র এক-তৃতীয়াংশ হবে জগদীশচন্দ্রের বেতন। এই ঘটনায় জগদীশচন্দ্র অত্যন্ত অপমানিত বোধ করেন। তিনি ঘৃণাভরে বেতন বয়কট করেন। কিন্তু তখন তাঁর অর্থের অত্যন্ত প্রয়োজন। এর আগে চার বছর জগদীশচন্দ্র বিলেতে লেখাপড়া শিখেছেন। তাতে তাঁর পিতার অনেক অর্থ ব্যয় হয়েছে। তিনি কিছু ধারও করেছিলেন, সংসার চালাতে জগদীশচন্দ্রকে অনেক কষ্ট স্বীকার করতে হত। তবু

তিনি নিজের সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসেননি। তিন বছর বেতন বয়কট করার পর অবশ্য ইংরেজ কর্তাদের টনক নড়ে। তখন তাঁরা জগদীশচন্দ্রকে পূর্ণ বেতন দিয়ে তাঁর উপযুক্ত মর্যাদা দেন।

জগদীশচন্দ্রের মৌলিক গবেষণা ইতিমধ্যেই বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রশংসিত হচ্ছিল। পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানীমহলও জগদীশচন্দ্রের গবেষণায় আকৃষ্ট হয়েছিলেন। অবশেষে ছোটলাটের কানেও কথাটা গেল। ছোটলাট জগদীশচন্দ্রের জন্য উচ্চবেতনে একটি পদ সৃষ্টি করতে চাইলেন। বলা হল ওই পদ গ্রহণ করলে জগদীশচন্দ্র আরও ভালভাবে গবেষণার কাজ চালিয়ে যেতে পারবেন। গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থেরও কোন অভাব হবে না। স্থির হল কিছুদিনের মধ্যেই জগদীশচন্দ্রকে নিয়োগপত্র দেওয়া হবে। কিন্তু ওই পদে যোগদান করতে হলে যে সব শর্ত আরোপ করা হল তা জগদীশ-চন্দ্রের মনঃপূত হল না। নির্দ্বিধায় তিনি ওই পদ প্রত্যাখ্যান করলেন।

ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে সে জগদীশচন্দ্র ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজ মনোনীত সিনেটার। সেই সময় সিনেটের একটি সভায় জগদীশচন্দ্র একটি প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট দেওয়ায় ইংরেজ সরকারের স্বার্থ ব্যাহত হয়। এই ঘটনায় শিক্ষা-বিভাগের কর্তৃপক্ষ জগদীশচন্দ্রের কাছে কৈফিয়ত দাবি করলেন। প্রত্যুত্তরে জগদীশচন্দ্র সিনেটের সদস্যপদ ত্যাগ করতে চাইলেন। তখন ইংরেজ কর্তৃপক্ষ জগদীশচন্দ্রের কাছে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হলেন।

১৯০২ খ্রীস্টাব্দে শারীরবিজ্ঞানী স্যার জন বার্ডন স্যাণ্ডারসনের আপত্তিতে জগদীশচন্দ্রের একটি প্রবন্ধ রয়াল সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশিত হল না। এদিকে প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে জগদীশচন্দ্র যে ছুটি নিয়েছিলেন তার মেয়াদ শেষ হওয়ার মুখে। অথচ জগদীশচন্দ্র দেখলেন তিনি যদি তাঁর মৌলিক গবেষণালব্ধ তথ্য পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানীদের কাছে প্রতিষ্ঠিত না করতে পারেন তবে তাঁর শ্রম নিষ্ফল

হবে। তাই তিনি কর্তৃপক্ষের কাছে চিঠি দিয়ে অনুরোধ জানালেন তাঁর ছুটি আরও কিছুদিনের জন্য বাড়িয়ে দিতে। কিন্তু তখনকার ভারত সচিব জগদীশচন্দ্রের অনুরোধ মানতে চাইলেন না। ক্ষুব্ধ জগদীশচন্দ্র ভারত সচিবকে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিলেন যে আরও কিছু দিনের জন্য তাঁর ছুটি বাড়িয়ে না দিলে তিনি পদত্যাগ করবেন। তাঁর এই চিঠি পেয়ে ভারত সচিব জগদীশচন্দ্রের ইচ্ছানুসারে আরও কিছু দিনের জন্য ছুটি মঞ্জুর করেন।

প্রেসিডেন্সী কলেজে নতুন রসায়নাগার "বেকার লেবরেটরীর" দ্বার উদ্‌ঘাটিত হবে। দিন স্থির করে প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষ জেমস লাটসাহেব লর্ড কারমাইকেলকে আমন্ত্রণ করলেন নির্দিষ্ট দিনে লেবরেটরীর দ্বার উদ্‌ঘাটন করবার জন্য। অন্যান্য আমন্ত্রিতদের কাছেও চিঠি চলে গেল। অথচ লেবরেটরীর অধ্যক্ষ জগদীশচন্দ্রকে কিছুই জানান হল না। ঘটনাটা জগদীশচন্দ্র জানতে পারলেন এক ছাত্র অধ্যাপকের মারফত। এই ঘটনায় জগদীশচন্দ্র অত্যন্ত অপমানিত বোধ করলেন। কিছুদিনের মধ্যেই এই অপমানের প্রতিশোধের নেওয়ার সুযোগ এসে গেল। বাংলার লাটসাহেব লর্ড কারমাইকেল কয়েকদিন আগে জগদীশচন্দ্রকে একটি চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন যে তিনি জগদীশচন্দ্রের গবেষণাগারে এসে তাঁর গবেষণা সম্বন্ধে অবহিত হতে ইচ্ছুক। জগদীশচন্দ্র সেন দিন স্থির করে লাটসাহেবকে জানিয়ে দেন। বেকার লেবরেটরীর দ্বার উদ্‌ঘাটন হওয়ার কথা যে তারিখে তার কয়েকদিন আগেই একটা দিন স্থির করে সেইদিন লর্ড কারমাইকেলকে তাঁর পরীক্ষাগারে এসে তাঁর গবেষণালব্ধ তথ্যে প্রমাণ প্রত্যক্ষ করবার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। কারমাইকেলের সচিব নির্দিষ্ট তারিখ অনুমোদন করলেন এবং জগদীশচন্দ্রকে ও প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষ জেমসকে তাঁর কলেজে আসার খবরটি জানিয়ে দিলেন। জেমস চিঠি পেয়ে অবাক হয়ে গেলেন। বেকার লেবরেটরীর দ্বারোদ্‌ঘাটনের আগেই লর্ড কারমাইকেল ওই লেবরেটরীতে জগদীশচন্দ্রের গবেষণা

দেখতে আসবেন! জগদীশচন্দ্রকে এই সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হল। জগদীশচন্দ্র তখন লাটসাহেবের চিঠি জেমসকে দেখালেন এবং বললেন লাটসাহেব কবে লেবরেটরীর দ্বারোদঘাটন করবেন তা তো তিনি জানেন না। সুতরাং তিনি তাঁর সুবিধামত তারিখে কারমাইকেলকে আমন্ত্রণ করেছেন। এইভাবে ক্ষুব্ধ জগদীশচন্দ্র তাঁর উপরওয়ালা জেমসের ওপর অপমানের প্রতিশোধ নিলেন।

জগদীশচন্দ্রের সাহিত্যকীর্তি ঃ

জগদীশচন্দ্র বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী। কিন্তু এই অসাধারণ বিজ্ঞান-প্রতিভা সাহিত্যেও ছিলেন সমান পারদর্শী এবং অনুরাগী। সব থেকে আশ্চর্য হতে হয় যখন দেখি যে যুগে ইংরেজি সংস্কৃতির প্রভাব দেশকে গ্রাস করেছে সেই যুগে জগদীশচন্দ্রই বাংলা ভাষায় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লেখা শুরু করেন এবং সমসাময়িক ছাত্র ও বিজ্ঞান শিক্ষককে মাতৃভাষায় বিজ্ঞান চর্চায় উদ্বুদ্ধ করেন। সুবোধচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা "আচার্য জগদীশচন্দ্র" গ্রন্থে সংকলিত জগদীশচন্দ্রের বাংলায় লেখা কয়েকটি প্রবন্ধ এখানে তুলে দিচ্ছি। এই লেখা পড়লেই বোঝা যাবে বাংলা সাহিত্যে জগদীশচন্দ্রের প্রীতি ও পারদর্শিতা।

১৯১১ খ্রীস্টাব্দে ময়মনসিংহ সাহিত্য সম্মেলনে জগদীশচন্দ্রের ভাষণ—বিজ্ঞানে সাহিত্য ঃ

"জড় জগতে কেন্দ্র আশ্রয় করিয়া বহুবিধ গতি দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রহগণ সূর্যের আকর্ষণ এড়াইতে পারে না। উচ্ছৃঙ্খল ধূমকেতুকেও একদিন সূর্যের দিকে ছুটিতে হয়।"

"জড় জগৎ ছাড়িয়া জঙ্গম জগতে দৃষ্টিপাত করিলে তাহাদের গতিবিধি বড় অনিয়মিত বলিয়া মনে হয়। মাধ্যাকর্ষণ শক্তি ছাড়াও অসংখ্য শক্তি তাহাদিগকে সর্বদা সন্তাড়িত করিতেছে। প্রতি মুহূর্তে তাহারা আহত হইতেছে এবং সেই আঘাতের গুন ও পরিমাণ

অনুসারে প্রত্যুত্তরে তাহারা হাসিতেছে কিংবা কাঁদিতেছে। মৃদু স্পর্শ ও মৃদু আঘাত ; ইহার প্রত্যুত্তরে শারীরিক রোমাঞ্চ, উৎফুল্ল ভাব ও নিকটে আসিবার ইচ্ছা। কিন্তু আঘাতের মাত্রা বাড়াইলে অন্যরকমে তাহার উত্তর পাওয়া যায়। হাত বুলাইবার পরিবর্তে যেখানে লগুড়াঘাত, সেখানে রোমাঞ্চ ও উৎফুল্লতার পরিবর্তে সন্ত্রাস ও পূর্ণমাত্রায় সঙ্কোচ। আকর্ষণের পরিবর্তে বিকর্ষণ—সুখের পরিবর্তে দুঃখ—হাসির পরিবর্তে কান্না।"

"জীবের গতিবিধি কেবলমাত্র বাহিরের আঘাতের দ্বারা পরিমিত হয় না। ভিতর হইতে নানাবিধ আবেগ আসিয়া বাহিরের গতিকে জটিল করিয়া রাখিয়াছে। ভিতরের আবেগ কতকটা অভ্যাস, কতকটা স্বেচ্ছাকৃত। এইরূপ বহুবিধ ভিতর ও বাহিরের আঘাত-আবেগের দ্বারা চালিত মানুষের গতি কে নিরুপণ করিতে পারে ? কিন্তু মাধ্যাকর্ষণ শক্তি কেহ এড়াইতে পারে না। সেই অদৃশ্য শক্তি বলে বহু বৎসর পরে আজ আমি আমার জন্মস্থানে উপনীত হইয়াছি। জন্মলাভ সূত্রে জন্মস্থানের যে একটা আকর্ষণ আছে তাহা স্বাভাবিক। কিন্তু আজ এই যে সভার সভাপতির আসনে আমি স্থান লইয়াছি তাহার যুক্তি একেবারে স্বতঃসিদ্ধ নহে। প্রশ্ন হইতে পারে, সাহিত্যক্ষেত্রে কি বিজ্ঞান-সেবকের স্থান আছে। এই সাহিত্য সম্মেলন বাঙালীর মনের এক ঘনীভূত চেতনাকে বাংলাদেশের এক সীমা হইতে অন্য সীমায় বহন করিয়া লইয়া চলিয়াছে এবং সফলতার চেষ্টাকে সর্বত্র গভীরভাবে জাগাইয়া তুলিয়াছে। ইহা হইতে স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি, এই সম্মিলনের মধ্যে বাঙালার যে ইচ্ছা আকার ধারণ করিয়া উঠিতেছে তাহার মধ্যে কোন সংকীর্ণতা নাই। এখানে সাহিত্যকে কোন ক্ষুদ্র কোঠার মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হয় নাই, বরং মনে হয়, আমরা উহাকে বড় করিয়া উপলব্ধি করিবার সংকল্প করিয়াছি।"

"এই সাহিত্য সম্মেলন যজ্ঞে যাহাদিগকে পুরোহিত পদে বরণ

করা হইয়াছে তাহাদের মধ্যে বৈজ্ঞানিককেও দেখিয়াছি। আমি যাহাকে সুহৃদ ও সহযোগী বলিয়া স্নেহ করি এবং স্বদেশীয় বলিয়া গৌরব করিয়া থাকি, সেই আমাদের দেশমান্য আচার্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র একদিন এই সম্মিলন সভার প্রধান আসন অলঙ্কৃত করিয়াছেন। তাঁহাকে সমাদর করিয়া সাহিত্য সম্মিলন যে কেবল গুণের পূজা করিয়াছেন তাহা নহে, সাহিত্যের একটি উদার মূর্তি দেশের সম্মুখে প্রকাশ করিয়াছেন।"

"পাশ্চাত্যদেশে জ্ঞানরাজ্যে এখন ভেদবুদ্ধির অত্যন্ত প্রচলন হইয়াছে। সেখানে জ্ঞানের প্রত্যেক শাখা-প্রশাখা নিজেকে স্বতন্ত্র রাখিবার বিশেষ আয়োজন করিয়াছে, তাহার ফলে নিজেকে এক করিয়া জানিবার চেষ্টা এখন লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। জ্ঞান সাধনার প্রথমাবস্থায় এইরূপ জাতিভেদ প্রথায় উপকার করে। তাহাতে উপকরণ সংগ্রহ করা এবং তাহাকে সজ্জিত করিবার সুবিধা হয়; কিন্তু শেষ পর্যন্ত যদি কেবল এই প্রথাকেই অনুসরণ করি তাহা হইলে সত্যের পূর্ণমূর্তি প্রত্যক্ষ করা ঘটিয়া উঠে না; কেবল সাধনাই চলিতে থাকে, সিদ্ধির দর্শন পাই না।"

"অপরদিকে বহুর মধ্যে এক যাহাতে হারাইয়া না যায়, ভারতবর্ষ সেইদিকে সর্বদা লক্ষ্য রাখিয়াছে। সেই চিরকালের সাধনার ফলে আমরা সহজেই এককে দেখিতে পাই, আমাদের মনে সে সম্বন্ধে কোন প্রবল বাধা ঘটে না।"

"আমি অনুভব করিতেছি, আমাদের সাহিত্য সম্মিলনের ব্যাপারে স্বভাবতই এই ঐক্যবোধ কাজ করিয়াছে। আমরা এই সম্মিলনের প্রথম হইতেই সাহিত্যের সীমা নির্ণয় করিয়া তাহার অধিকারের দ্বার সংকীর্ণ করিতে মনেও করি নাই। পরন্তু আমরা তাহার অধিকারকে সহজেই প্রসারিত করিয়া দিবার দিকেই চলিয়াছি।'

"ফলতঃ জ্ঞান অন্বেষণে আমরা অজ্ঞাতসারে এক সর্বব্যাপী একতার দিকে অগ্রসর হইতেছি। সেই সঙ্গে সঙ্গে আমরা নিজেদের এক

বৃহৎ পরিচয় জানিবার জন্য উৎসুক হইয়াছি। আমরা কি চাহিতেছি, কি ভাবিতেছি, কি পরীক্ষা করিতেছি, তাহা একস্থানে দেখিলে আপনাকে প্রকৃতরূপে দেখিতে পাইব। সেইজন্য আমাদের দেশে আজ যে কেহ গান করিতেছে, ধ্যান করিতেছে, অন্বেষণ করিতেছে, তাঁহাদের সকলকেই এই সাহিত্য সম্মিলনে সমবেত করিবার আহ্বান প্রেরিত হইয়াছে।"

"এই কারণে, যদিও জীবনের অধিকাংশকাল আমি বিজ্ঞানের অনুশীলনে যাপন করিয়াছি, তথাপি সাহিত্য সম্মিলন সভার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে দ্বিধাবোধ করি নাই। কারণ আমি যাহা খুঁজিয়াছি, দেখিয়াছি, লাভ করিয়াছি, তাহাকে দেশের অন্যান্য নানান লাভের সঙ্গে সাজাইয়া ধরিবার অপেক্ষা আর কি সুখ হইতে পারে? আর এই সুযোগে আজ আমাদের দেশের সমস্ত সত্য সাধকদের সহিত এক সভায় মিলিত হইবার অধিকার যদি লাভ করিয়া থাকি তবে তাহা অপেক্ষা আনন্দ আমার আর কি হইতে পারে?"

কবিতা ও বিজ্ঞান ঃ

কবি এই বিশ্বজগতে তাঁহার দৃষ্টি দিয়া একটি অরূপকে দেখিতে পান, তাহাকেই তিনি রূপের মধ্যে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করেন। অন্যের দেখা সেখানে ফুরাইয়া যায় সেখানেও তাঁহার ভাবের দৃষ্টি অবরুদ্ধ হয় না। সেই অপরূপ দেশের বার্তা তাঁহার কাব্যের ছন্দে ছন্দে নানা আভাসে বাজিয়া উঠিতে থাকে। বৈজ্ঞানিকের পন্থা স্বতন্ত্র হইতে পারে, কিন্তু কবিত্ব সাধনার সহিত তাঁহার সাধনার ঐক্য আছে। দৃষ্টির আলোক যেখানে শেষ হইয়া যায় সেখানেও তিনি আলোকের অনুসরণ করিতে থাকেন, শ্রুতির শক্তি যেখানে সুরের শেষ সীমায় পৌঁছায় সেখান হইতেও তিনি কম্পমান বাণী আহরণ করিয়া আনেন। প্রকাশের অতীত যে রহস্য প্রকাশের আড়ালে বসিয়া দিনরাত্রি কাজ করিতেছে, বৈজ্ঞানিক তাহাকেই প্রশ্ন করিয়া

দুর্বোধ উত্তর বাহির করিতেছেন এবং সেই উত্তরকেই মানব ভাষায় যথাযথ করিয়া ব্যক্ত করিতে নিযুক্ত আছেন।”

“এই যে প্রকৃতির রহস্য-নিকেতন, ইহার নানা মহল, ইহার দ্বার অসংখ্য। প্রকৃতি বিজ্ঞানবিৎ, রাসায়নিক, জীবতত্ত্ববিৎ ভিন্ন ভিন্ন দ্বার দিয়া এক এক মহলে প্রবেশ করিয়াছেন ; মনে করিয়াছেন, সেই সেই মহলেই বুঝি তাহার বিশেষ স্থান, অন্য মহলে বুঝি তার গতিবিধি নাই। তাই জড়কে, উদ্ভিদকে, সচেতনকে তাঁহারা অলঙ্ঘভাবে বিভক্ত করিয়াছেন। কিন্তু এই বিভাগকে দেখাই যে বৈজ্ঞানিক দেখা, একথা আমি স্বীকার করি না। কক্ষে কক্ষে সুবিধার জন্য যত দেওয়াল তোলাই যাক না, সকল মহলেরই এক অধিষ্ঠাতা। সকল বিজ্ঞানই পরিশেষে এই সত্য আবিষ্কার করিবে বলিয়া ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়া যাত্রা করিয়াছে। সকল পথই যেখানে একত্র মিলিয়াছে সেইখানেই পূর্ণ সত্য! সত্য খণ্ড খণ্ড হইয়া আপনার মধ্যে অসংখ্য বিরোধ ঘটাইয়া অবস্থিত নহে। সেইজন্য প্রতিদিনই দেখিতে পাই জীবতত্ত্ব, রসায়নতত্ত্ব, প্রকৃতিতত্ত্ব, আপন আপন সীমা হারাইয়া ফেলিতেছে।”

“বৈজ্ঞানিক ও কবি, উভয়েরই অনুভূতি অনির্বচনীয় একের সন্ধানে বাহির হইয়াছে। প্রভেদ এই, কবি পথের কথা ভাবেন না, বৈজ্ঞানিক পথটাকে উপেক্ষা করেন না। কবিকে সর্বদা আত্মহারা হইতে হয়, আত্মসম্বরণ করা তাঁহার পক্ষে অসাধ্য। কিন্তু কবির কবিত্ব নিজের আবেগের মধ্য হইতে তো প্রমাণ বাহির করিতে পারে না। এজন্য তাঁহাকে উপমার ভাষা ব্যবহার করিতে হয়। সকল কথায় তাঁহাকে ‘যেন’ যোগ করিয়া দিতে হয়।”

“বৈজ্ঞানিককে যে পথ অনুসরণ করিতে হয় তাহা একান্ত বন্ধুর এবং পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের কঠোর পথে তাঁহাকে সর্বদা আত্মসম্বরণ করিয়া চলিতে হয়। সর্বদা তাঁহার ভাবনা, পাছে নিজের মন নিজেকে ফাঁকি দেয়। এজন্য পদে পদে মনের কথাটা বাহিরের সঙ্গে মিলাইয়া

চলিতে হয়। দুই দিক হইতে যেখানে না মিলে সেখানে তিনি একদিনের কথা কোন মতেই গ্রহণ করিতে পারেন না।"

"ইহার পুরস্কার এই যে, তিনি যেটুকু পান তাহার চেয়ে কিছুমাত্র বেশী দাবী করিতে পারেন না বটে। কিন্তু সেটুকু তিনি নিশ্চিতরূপেই পান এবং ভাবী পাওয়ার সম্ভাবনাকে তিনি কখনও কোন অংশে দুর্বল করিয়া রাখেন না।"

"কিন্তু এমন যে কঠিন নিশ্চিতের পথ, এই পথ দিয়াও বৈজ্ঞানিক সেই অপরিসীম রহস্যের অভিমুখেই চলিয়াছেন। এমন বিস্ময়ের রাজ্যের মধ্যে গিয়া উত্তীর্ণ হইতেছেন যেখানে অদৃশ্য আলোক রশ্মির পথের সম্মুখে স্থূল পদার্থের বাধা একেবারেই শূন্য হইয়া যাইতেছে এবং যেখানে বস্তু ও শক্তি এক হইয়া দাঁড়াইতেছে। এইরূপ হঠাৎ চক্ষুর আবরণ অপসারিত হইয়া এক অচিন্তনীয় রাজ্যের দৃশ্য যখন বৈজ্ঞানিককে অভিভূত করে তখন মুহূর্তের জন্য তিনিও আপনার স্বাভাবিক আত্মসংবরণ করিতে বিস্মৃত হন এবং বলিয়া উঠেন "যেন নহে—এই সেই।"

অদৃশ্য আলোক ঃ

"কবিতা ও বিজ্ঞানের কি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তাহার উদাহরণস্বরূপ আপনাদিগকে এক অত্যাশ্চর্য অদৃশ্য জগতে প্রবেশ করিতে আহ্বান করিব। সেই অসীম রহস্যপূর্ণ জগতের এক ক্ষুদ্র কোণে আমি যাহা কতক স্পষ্ট কতক অস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করিয়াছি, কেবলমাত্র তাহার সম্বন্ধেই দুই একটি কথা বলিব। কবির চক্ষু এই বহু রঙে রঞ্জিত আলোক সমুদ্র দেখিয়াও অতৃপ্ত রহিয়াছে। এই সাতটি রং তাহার তৃষ্ণা মিটাইতে পারে নাই। তবে কি এই দৃশ্য আলোকের সীমা পার হইয়াও অসীম আলোকপুঞ্জ প্রসারিত রহিয়াছে?"

"এইরূপ অচিন্তনীয় অদৃশ্য আলোকের রহস্য যে আছে, তাহার পথ জার্মানীর অধ্যাপক হার্টজ প্রথম দেখাইয়া দেন। তড়িৎ-

ঊর্মিসঞ্জাত সেই অদৃশ্য আলোকের প্রকৃতি সম্বন্ধে কতকগুলি তত্ত্ব প্রেসিডেন্সি কলেজের পরীক্ষাগারে আলোচিত হইয়াছে। সময় থাকিলে দেখাইতে পারিতাম, কিরূপে অস্বচ্ছ বস্তুর আভ্যন্তরিক আণবিক সন্নিবেশ এই অদৃশ্য আলোকের দ্বারা ধরা যাইতে পারে। আপনারা আরও দেখিতেন, বস্তুর স্বচ্ছতা ও অস্বচ্ছতা সম্বন্ধে অনেক ধারণাই ভুল। যাহা অস্বচ্ছ মনে করি তাহার ভিতর দিয়া আলো অবাধে যাইতেছে। আবার এমন অদ্ভুত বস্তুও আছে যাহা একদিক ধরিয়া দেখিলে স্বচ্ছ, অন্যদিক ধরিয়া দেখিলে অস্বচ্ছ। আরও দেখিতে পাইতেন যে দৃশ্য আলোক যেরূপ বহুমূল্য কাচ-বর্তুল দ্বারা দূরে অক্ষীণভাবে প্রেরণ করা যাইতে পারে সেইরূপ মৃৎ-বর্তুল সাহায্যে অদৃশ্য আলোকপুঞ্জও বহুদূরে প্রেরিত হয়। ফলতঃ দৃশ্য আলোক সংহত করিবার জন্য হীরকখণ্ডের যেরূপ ক্ষমতা, অদৃশ্য আলোক সংহত করিবার জন্য মৃৎপিণ্ডের ক্ষমতা তাহা অপেক্ষাও অধিক।"

"আকাশ সঙ্গীতের অসংখ্য সুর সপ্তকের মধ্যে একটি সপ্তকমাত্র আমাদের দর্শনেন্দ্রিয়কে উত্তেজিত করে। সেই ক্ষুদ্র গণ্ডীটিই আমাদের দৃশ্য রাজ্য। অসীম জ্যোতিরাশির মধ্যে আমরা অন্ধবৎ ঘুরিতেছি। অসহ্য এই মানুষের অপূর্ণতা। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও মানুষের মন একেবারে ভাঙ্গিয়া যায় নাই। সে অদম্য উৎসাহে নিজের অপূর্ণতার ভেলায় অজানা সমুদ্র পার হইয়া নূতন দেশের সন্ধানে ছুটিয়াছে।"

বৃক্ষ জীবনের ইতিহাস ঃ

"দৃশ্য আলোকের বাহিরে অদৃশ্য আলোক আছে, তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিলে আমাদের দৃষ্টি যেমন অন্তরের মধ্যে প্রসারিত হয়, তেমনি চেতন রাজ্যের বাহিরে যে বাক্যহীন বেদনা আছে তাহাকে বোধগম্য করিলে আমাদের অনুভূতি আপনার ক্ষেত্রকে বিস্তৃত করিয়া দেখিতে পায়। সেইজন্য রুদ্র জ্যোতির রহস্যলোক হইতে এখন শ্যামল উদ্ভিদরাজ্যের গভীরতম নিরবতার মধ্যে আপনাদিগকে আহ্বান করিব।"

"প্রতিদিন এই যে অতি বৃহৎ উদ্ভিদজগৎ আমাদের চক্ষুর সম্মুখে প্রসারিত, ইহাদের জীবনের সহিত কি আমাদের জীবনের কোন সম্বন্ধ আছে? উদ্ভিদতত্ত্ব সম্বন্ধে অগ্রগণ্য পণ্ডিতেরা ইহাদের সঙ্গে কোন আত্মীয়তা স্বীকার করিতে চান না। বিখ্যাত বার্ডন সেণ্ডারসন বলেন যে, কেবল দুই চারি প্রকারের গাছ ছাড়া সাধারণ বৃক্ষ বাহিরের আঘাতে দৃশ্যভাবে কিংবা বৈদ্যুতিক চাঞ্চল্যের দ্বারা সাড়া দেয় না। আর লাজুক জাতীয় গাছ যদিও বৈদ্যুতিক সাড়া দেয় তবু সেই সাড়া জন্তুর সাড়া হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ফেফর প্রমুখ উদ্ভিদশাস্ত্রের অগ্রণী পণ্ডিতগণ একবাক্যে বলিয়াছেন যে বৃক্ষ স্নায়ুহীন। আমাদের স্নায়ু-সূত্র যেরূপ বাহিরের বার্তা বহন করিয়া আনে, উদ্ভিদে এইরূপ কোন সূত্র নাই।"

"ইহা হইতে মনে হয়, পাশাপাশি যে প্রাণী ও উদ্ভিদ জীবন প্রবাহিত হইতে দেখিতেছি তাহা বিভিন্ন নিয়মে পরিচালিত। উদ্ভিদ জীবনে বিবিধ সমস্যা অত্যন্ত দুরূহ—সেই দুরূহতা ভেদ করিবার জন্য অতি সূক্ষ্মদর্শী কোন কল এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। প্রধানত এ জন্যই প্রত্যক্ষ পরীক্ষার পরিবর্তে অনেক স্থলে মনগড়া মতের আশ্রয় লইতে হইয়াছে।"

"কিন্তু প্রকৃত তত্ত্ব জানিতে হইলে আমাদিগকে মতবাদ ছাড়িয়া পরীক্ষার প্রত্যক্ষ ফল পাইবার চেষ্টা করিতে হইবে। নিজের কল্পনাকে ছাড়িয়া বৃক্ষকেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে হইবে এবং কেবলমাত্র বৃক্ষের স্বহস্ত লিখিত বিবরণই সাক্ষ্যরূপে গ্রহণ করিতে হইবে।"

বৃক্ষের দৈনন্দিন ইতিহাস :

বৃক্ষের আভ্যন্তরিক পরিবর্তন আমরা কি করিয়া জানিব? যদি কোন অবস্থাগুণে বৃক্ষ উত্তেজিত হয় বা অন্য কোন কারণে বৃক্ষের অবসাদ উপস্থিত হয় তবে এইসব ভিতরের অদৃশ্য পরিবর্তন আমরা বাহির হইতে কি করিয়া বুঝিব? তাহার একমাত্র উপায়—সকল

প্রকার আঘাতে গাছ যে সাড়া দেয় কোন প্রকারে তাহা ধরিতে ও মাপিতে পারা।”

“জীব যখন কোন বাহিরের শক্তি দ্বারা আহত হয় তখন সে নানারূপে তাহার সাড়া দিয়া থাকে। যদি কণ্ঠ থাকে তবে চীৎকার করিয়া, যদি মূক হয় তবে হাত পা নাড়িয়া। বাহিরের ধাক্কা কিংবা “নাড়ার” উত্তরে “সাড়া”। নাড়ার পরিমাণ অনুসারে সাড়ার পরিমাণ মিলাইয়া দেখিলে আমরা জীবনের পরিমাণ মাপিয়া লইতে পারি। উত্তেজিত অবস্থায় অল্প নাড়ায় প্রকাণ্ড সাড়া পাওয়া যায়। অবসন্ন অবস্থায় অধিক নাড়ায় ক্ষীণ সাড়া। আর যখন মৃত্যু আসিয়া জীবকে পরাভূত করে তখন হঠাৎ সর্বপ্রকারের সাড়ার অবসান হয়।”

“সুতরাং বৃক্ষের আভ্যন্তরিক অবস্থা ধরা যাইতে পারিত, যদি বৃক্ষকে দিয়া তাহার সাড়াগুলি কোন প্ররোচনায় কাগজ-কলমে লিপিবদ্ধ করাইয়া লইতে পারিতাম।”

“সেই আপাততঃ অসম্ভব কার্যে কোন উপায়ে যদি সফল হইতে পারি তাহার পরে সেই নূতন লিপি এবং নূতন ভাষা আমাদিগকে শিখিয়া লইতে হইবে। নানান দেশের নানান ভাষা, সে ভাষা লিখিবার অক্ষরও নানাবিধ, তার মধ্যে আবার এক নূতন লিপি প্রচার করা যে একান্ত শোচনীয় তাহাতে সন্দেহ নাই। এক-লিপি সভার সভ্যগণ ইহাতে ক্ষুণ্ণ হইবেন, কিন্তু এই সম্বন্ধে অন্য উপায় নাই। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, গাছের লেখা কতকটা দেবনাগরীর মত— অশিক্ষিত কিংবা অর্ধ-শিক্ষিতের পক্ষে একান্ত দুর্বোধ্য।”

“সে যাহা হউক, মানস সিদ্ধির পক্ষে দুইটি প্রতিবন্ধক—প্রথমতঃ, গাছকে নিজের সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিতে সম্মত করান, দ্বিতীয়তঃ, গাছ ও কলের সাহায্যে তাহার সেই সাহায্য লিপিবদ্ধ করা। শিশুকে দিয়া আজ্ঞা পালন অপেক্ষাকৃত সহজ, কিন্তু গাছের নিকট হইতে উত্তর আদায় করা অতি কঠিন সমস্যা। প্রথম প্রথম এই চেষ্টা অসম্ভব বলিয়া মনে হইত। তবে বহু বৎসরের ঘনিষ্ঠতা নিবন্ধন তাহাদের

প্রকৃতি অনেকটা বুঝিতে পারিয়াছি। এই উপলক্ষে আজ আমি সহৃদয় সভ্য সমাজের নিকট স্বীকার করিতেছি, নিরীহ গাছপালার নিকট হইতে বলপূর্বক সাক্ষ্য আদায় করিবার জন্য তাহাদের প্রতি অনেক নিষ্ঠুর আচরণ করিয়াছি। এইজন্য বিচিত্র প্রকারের চিম্‌টি উদ্ভাবন করিয়াছি—সোজাসুজি অথবা ঘূর্ণায়মান। সূচ দিয়া বিদ্ধ করিয়াছি এবং এসিড দিয়া পোড়াইয়াছি। সে সব কথা অধিক বলিব না। তবে আজ জানি যে, এই প্রকার জবরদস্তি দ্বারা যে সাক্ষ্য আদায় করা যায় তাহার কোন মূল্য নাই। ন্যায়পরায়ণ বিচারক এই সাক্ষ্যকে কৃত্রিম বলিয়া সন্দেহ করিতে পারেন।"

"যদি গাছ লেখনি-যন্ত্রের সাহায্যে তাহার বিবিধ সাড়া লিপিবদ্ধ করিত তাহা হইলে বৃক্ষের প্রকৃত ইতিহাস সমুদ্ধার করা যাইতে পারিত। কিন্তু এই কথা ত দিবাস্বপ্ন মাত্র। ঐরূপ কল্পনা আমাদের জীবনের নিশ্চেষ্ট অবস্থাকে কিঞ্চিৎ ভাবাবিষ্ট করে মাত্র। ভাবুকতার তৃপ্তি সহজসাধ্য; কিন্তু অহিফেনের ন্যায় ইহা ক্রমে ক্রমে মর্মগ্রন্থি শিথিল করে।"

"যখন স্বপ্নরাজ্য হইতে উঠিয়া কল্পনাকে কর্মে পরিণত করিতে চাই তখনই সম্মুখে দুর্ভেদ্য প্রাচীর দেখিতে পাই। প্রকৃতি দেবীর মন্দির লৌহ-অর্গলিত। সেই দ্বার ভেদ করিয়া শিশুর আব্দার এবং ক্রন্দনধ্বনি ভিতরে পৌঁছে না; কিন্তু যখন বহুকালের একাগ্রতা—সঞ্চিত শক্তি বলে রুদ্ধদ্বার ভাঙ্গিয়া যায় তখনই প্রকৃতি দেবী সাধকের নিকট আবির্ভূত হন।"

ভারতে অনুসন্ধানে বাধা

"সর্বদা শুনিতে পাওয়া যায় যে, আমাদের দেশে যথোচিত উপকরণ বিশিষ্ট পরীক্ষাগারের অভাবে অনুসন্ধান অসম্ভব। একথা যদিও অনেক পরিমাণে সত্য, কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ সত্য নহে। যদি ইহাই সত্য হইত, তাহা হইলে অন্য দেশে, যেখানে পরীক্ষাগার নির্মাণে

কোটি মুদ্রা ব্যয়িত হইয়াছে, সে স্থান হইতে প্রতিদিন নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইত। কিন্তু সেরূপ সংবাদ শোনা যাইতেছে না। আমাদের অনেক অসুবিধা আছে, অনেক প্রতিবন্ধক আছে সত্য, কিন্তু পরের ঐশ্বর্যে আমাদের ঈর্ষা করিয়া কি লাভ? অবসাদ ঘুচাও। দুর্বলতা পরিত্যাগ কর। মনে কর, আমরা যে অবস্থাতে পড়ি না কেন, সেই আমাদের প্রকৃষ্ট অবস্থা। ভারতই আমাদের কর্মভূমি, এখানেই আমাদের কর্তব্য সমাধা করিতে হইবে। যে পৌরুষ হারাইয়াছে সেই বৃথা পরিতাপ করে।"

"পরীক্ষা সাধনে পরীক্ষাগারের অভাব ব্যতীত আরও বিঘ্ন আছে। আমরা অনেক সময়ে ভুলিয়া যাই যে, প্রকৃত পরীক্ষাগার আমাদের অন্তরে। সেই অন্তরতম দেশেই অনেক পরীক্ষা পরীক্ষিত হইতেছে। অন্তর দৃষ্টিকে উজ্জ্বল রাখিতে সাধনার প্রয়োজন হয়। তাহা অল্পেই ম্লান হইয়া যায়। নিরাসক্ত একাগ্রতা যেখানে নাই সেখানে বাহিরের আয়োজনও কোন কাজে লাগে না। কেবলই বাহিরের দিকে যাহাদের মন ছুটিয়া যায়, সত্যকে লাভ করিবার চেয়ে দশজনের কাছে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য যাহারা লালায়িত হইয়া উঠে, তাহারা সত্যের দর্শন পায় না। সত্যের প্রতি যাহাদের পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা নাই, ধৈর্যের সহিত তাহারা সমস্ত দুঃখ বহন করিতে পারে না; দ্রুতবেগে খ্যাতিলাভ করিবার লালসায় তাহারা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া যায়। এইরূপ চঞ্চলতা যাহাদের আছে, সিদ্ধির পথ তাহাদের জন্য নহে। কিন্তু সত্যকে যাহারা যথার্থ চায়, উপকরণের অভাব তাহাদের পক্ষে প্রধান অভাব নহে, কারণ দেবী সরস্বতীর যে নির্মল শ্বেতপদ্ম তাহা সোনার পদ্ম নহে, তাহা হৃদয় পদ্ম।"

গাছের লেখা

বৃক্ষের বিবিধ সাড়া লিপিবদ্ধ করিবার বিবিধ সূক্ষ্ম যন্ত্র নির্মাণের আবশ্যকতার কথা বলিতেছিলাম। দশ বৎসর আগে যাহা কল্পনা মাত্র

ছিল তাহা এই কয় বৎসর চেষ্টার পর কার্যে পরিণত হইয়াছে। সার্থকতার পুর্বে কত প্রযত্ন যে ব্যর্থ হইয়াছে তাহা এখন বলিয়া লাভ নাই এবং এই বিভিন্ন কলগুলির গঠন প্রণালী বর্ণনা করিয়াও আপনাদের ধৈর্যচ্যুতি করিব না। তবে ইহা বলা আবশ্যক যে, এই বিবিধ কলের সাহায্যে সময় গণনা এত সূক্ষ্ম হইবে যে এক সেকেণ্ডের সহস্র ভাগের একভাগ অনায়াসে নির্ণীত হইবে। আর এক কথা শুনিয়া আপনারা প্রীত হইবেন যে কলের নির্মাণ অন্যান্য সৌভাগ্যবান দেশেও অসম্ভব বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছে, সেই কল এদেশে আমাদের কারিগর দ্বারাই নির্মিত হইয়াছে। ইহার মনন ও গঠন সম্পূর্ণ এদেশীয়।"

"এইরূপ বহু পরীক্ষার পর বৃক্ষ জীবন ও মানবীয় জীবন যে একই নিয়মে পরিচালিত তাহা প্রমাণ করিতে সমর্থ হইয়াছি।"

"প্রায় বিশ বৎসর পূর্বে কোন প্রবন্ধে লিখিয়াছিলাম 'বৃক্ষজীবন যেন মানবজীবনেরই ছায়া।' কিছু না জানিয়াই লিখিয়াছিলাম। স্বীকার করিতে হয় সেটা যৌবনসুলভ অতি সাহস এবং কথার উত্তেজনা মাত্র। আজ সেই লুপ্ত স্মৃতি শব্দায়মান হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে এবং স্বপ্ন ও জাগরণ আজ একত্র আসিয়া মিলিত হইয়াছে।"

উপসংহার

"আমি সম্মিলন সভায় কি দেখিলাম, উপসংহারকালে আপনা-দিগের নিকট সেই কথা বলিব।

"বহুদিন পূর্বে দাক্ষিণাত্যে একবার গুহামন্দির দেখিতে গিয়াছিলাম। সেখানে এক গুহার অন্ধকারে বিশ্বকর্মার মূর্তি অধিষ্ঠিত দেখিলাম। সেখানে বিবিধ কারুগর তাহাদের আপন আপন কাজ করিবার নানা যন্ত্র দেবমূর্তির পদতলে রাখিয়া পূজা করিতেছে।

তাহাই দেখিতে দেখিতে ক্রমে আমি বুঝিতে পারিলাম, আমাদের

এই বাহুই বিশ্বকর্মার আয়ুধ। এই আয়ুধ চালনা করিয়া তিনি পৃথিবীর মৃৎপিণ্ডকে নানাপ্রকারে বৈচিত্র্যশালী করিয়া তুলিতেছেন। সেই মহাশিল্পীর আবির্ভাবের ফলেই আমাদের জড়দেহ চেতনাময় ও সৃজনশীল হইয়া উঠিয়াছে। সেই আবির্ভাবের ফলেই আমরা মন ও হস্তের দ্বারা সেই শিল্পীর নানা অভিপ্রায়কে নানারূপের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে শিখিয়াছি ; কখন শিল্পকলায়, কখন সাহিত্যে, কখন বিজ্ঞানে ”

“গুহামন্দিরে যে ছবিটি দেখিয়াছিলাম এখানে সভাস্থলে তাহাই আজ সজীবরূপে দেখিলাম। দেখিলাম আমাদের দেশের বিশ্বকর্মা বাঙ্গালী চিত্তের মধ্যে যে কাজ করিতেছেন তাহার সেই কাজের নানা উপকরণ। কোথাওবা তাহা কবি-কল্পনা, কোথাও যুক্তি-বিচার, কোথাও তথ্যসংগ্রহ! আমরা সেই সমস্ত উপকরণ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করিয়া এখানে তাঁহার পূজা করিতে আসিয়াছি।”

“মানবশক্তির মধ্যে এই দৈবশক্তির আবির্ভাব, ইহা আমাদের দেশের চিরকালের সংস্কার। দৈবশক্তির বলেই জগতে সৃজন ও সংহার হইতেছে। মানুষে দৈবশক্তির আবির্ভাব যদি সম্ভব হয়, তবে মানুষ সৃজন করিতেও পারে এবং সংহার করিতেও পারে। আমাদের মধ্যে যে জড়তা, যে ক্ষুদ্রতা, যে ব্যর্থতা আছে তাহাকে সংহার করিবার শক্তিও আমাদের মধ্যেই রহিয়াছে। এ সব দুর্বলতার বাধা আমাদের পক্ষে কখনই চিরসত্য নহে। যাহারা অমরত্বে অধিকারী তাহারা ক্ষুদ্র হইয়া থাকিবার জন্য জন্মগ্রহণ করে নাই।”

“সৃজন করিবার শক্তিও আমাদের মধ্যে বিদ্যমান। আমাদের যে জাতীয় মহত্ব লুপ্তপ্রায় হইয়া আসিয়াছে তাহা এখনও আমাদের অন্তরের সেই সৃজনী শক্তির জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে। ইচ্ছাকে জাগ্রত করিয়া তাহাকে পুনরায় সৃজন করিয়া তোলা আমাদের শক্তির মধ্যেই রহিয়াছে। আমাদের দেশের যে মহিমা একদিন অভ্রভেদ করিয়া উঠিয়াছিল তাহার উত্থানবেগ একেবারে পরিসমাপ্ত হয় নাই, পুনরায় একদিন তাহা আকাশ স্পর্শ করিবেই করিবে।”

"সেই আমাদের সৃজন শক্তিরই একটি চেষ্টা বাংলা সাহিত্য পরিষদে আজ সফল মূর্তি ধারণ করিয়াছে। এই পরিষদকে আমরা কেবল মাত্র একটি সভাস্থল বলিয়া গণ্য করিতে পারি না; ইহার ভিত্তি কলিকাতার কোন বিশেষ পথপার্শ্বে স্থাপিত হয় নাই এবং ইহার অট্টালিকা ইষ্টক দিয়া গ্রথিত নহে। আন্তরদৃষ্টিতে দেখিলে দেখিতে পাইব, সাহিত্য পরিষদ সাধকদের সম্মুখে দেবমন্দির রূপেই বিরাজমান। ইহার ভিত্তি সমগ্র বাংলাদেশের মর্মস্থলে স্থাপিত এবং ইহার অট্টালিকা আমাদের জীবনস্তর দিয়া রচিত হইতেছে। এই মন্দিরে প্রবেশ করিবার সময় আমাদের ক্ষুদ্র আমিত্বের সর্ব প্রকার অশুচি আবরণ যেন আমরা বাহিরে পরিহার করিয়া আসি এবং আমাদের হৃদয়-উদ্যানের পবিত্রতম ফুল ও ফলগুলিকে যেন পূজার উপহার স্বরূপ দেবচরণে নিবেদন করিতে পারি।"

দার্শনিক জগদীশচন্দ্র

জগদীশচন্দ্র কেবলমাত্র অসামান্য বিজ্ঞান প্রতিভার অধিকারী ছিলেন না। এই মহাশক্তিধর বিজ্ঞানীর মধ্যে আমরা একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিককেও দেখতে পাই। জগদীশচন্দ্রের অসংখ্য লেখা ও রচনার মধ্যে দার্শনিক জগদীশচন্দ্রকে স্বমহিমায় বিরাজ করিতে দেখি। "আকাশ স্পন্দন ও আকাশ-সম্ভব জগৎ" প্রবন্ধের এক জায়গায় জগদীশচন্দ্রের উক্তি—"মনে করো, অন্ধকার গৃহে অদৃশ্য শক্তিবলে বায়ু বারংবার আহত হইতেছে। কিছুই দেখা যাইতেছে না। কেবল নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া গম্ভীর ধ্বনি কর্ণে প্রবেশ করিতেছে। কম্পন-সংখ্যা যতই বর্ধিত করা যাইবে, সুর ততই উচ্চ হইতে উচ্চতর সপ্তমে উঠিবে। অবশেষে সহসা কর্ণবিদারী সুর থামিয়া নিস্তব্ধতায় পরিণত হইবে। ইহার পর লক্ষ লক্ষ তরঙ্গ কর্ণে আঘাত করিলেও আমরা তাহার কিছুই জানিতে পারিব না।"

"এক্ষণে বিদ্যুৎবলে আকাশে তরঙ্গ উৎপন্ন করা যাউক,

লক্ষাধিক তরঙ্গ প্রতি মুহূর্তে চতুর্দিকে ধাবিত হইবে। আমরা এই তরঙ্গান্দোলিত সাগরে নিমজ্জিত হইয়াও অক্ষুণ্ণ থাকিব। সুর ক্রমে উচ্চে উত্থিত হইতে থাকুক। প্রতি সেকেণ্ডে যখন কোটি কোটি তরঙ্গ উৎপন্ন হইবে, তখন অকস্মাৎ নিদ্রিত ইন্দ্রিয় জাগরিত হইয়া উঠিবে, শরীর উত্তাপ অনুভব করিবে। সুর আরও উত্থিত হইলে যখন অধিকতর সংখ্যক তরঙ্গ উৎপন্ন হইবে, তখন অন্ধকার ভেদ করিয়া রক্তিম আলোক-রেখা দেখা যাইবে। কম্পন সংখ্যার আরও বৃদ্ধি হউক—ক্রমে ক্রমে পীত, হরিৎ, নীল আলোকে গৃহ পূর্ণ হইবে। ইহার পর সুর আরও উচ্চে উঠিলে চক্ষু পরাস্ত হইবে, আলোকরাশি পুনরায় অদৃশ্য হইয়া যাইবে। ইহার পর অগণিত স্পন্দনে আকাশ স্পন্দিত হইলেও আমরা কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তাহা অনুভব করিতে পারিব না।"

"তবে ত আমরা এই সমুদ্রে একেবারে দিশাহারা। আমরা বধির ও অন্ধ। কি দেখিতে পাই, কি শুনিতে পাই ? কিছুই নয় ! দুই একখানা ভগ্ন দিক্‌দর্শন শলাকা লইয়া আমরা মহাসমুদ্রে যাত্রা করিয়াছি।"

উপরি-উক্ত লেখায় বিজ্ঞান, সাহিত্য এবং দর্শনের অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে। সাহিত্য এবং দর্শনের সমন্বয় ফুটে উঠেছে জগদীশচন্দ্রের রচিত "ভাগিরথীর উৎস সন্ধানে" নামক রচনার মধ্য দিয়েও। ওই রচনায় এক জায়গায় আছে "সহসা শত শত শঙ্খনাদ একত্রে কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করিল। অর্ধোন্মীলিত নেত্রে দেখিলাম সমগ্র পর্বত ও বনস্থলীতে পূজার আয়োজন হইয়াছে। জলপ্রপাতগুলি যেন সুবৃহৎ কমণ্ডলু মুখ হইতে পতিত হইতেছে। দূরে দিক আলোড়ন করিয়া শঙ্খধ্বনির ন্যায় গভীর ধ্বনি উঠিতেছে। ইহা শঙ্খধ্বনি, কি পতনশীল তুষার-পর্বতের বজ্রনিনাদ স্থির করিতে পারিলাম না।"

"কতক্ষণ পরে সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া যাহা দেখিলাম তাহাতে হৃদয় উচ্ছ্বসিত ও দেহ পুলকিত হইয়া উঠিল। এতক্ষণে যে কুজ্ঝটিকা

নন্দাদেবী ও ত্রিশূল আচ্ছন্ন করিয়াছিল তাহা উর্ধ্বে উথিত হইয়া শূন্যমার্গ আশ্রয় করিয়াছে। নন্দাদেবীর শিরোপরি এক অতি বৃহৎ ভাস্বর জ্যোতিঃ বিরাজ করিতেছে", তাহা একান্ত দুর্নিরীক্ষ। সেই জ্যোতিঃপুঞ্জ হইতে নির্গত ধূমরাশি দিগদিগন্ত ব্যাপিয়া রহিয়াছে। তবে এই কি মহাদেবের জটা ? এই জটা পৃথিবীরূপিণী নন্দাদেবীকে চন্দ্রাতপের ন্যায় আবরণ করিয়া রাখিয়াছে। এই জটা হইতে হীরক কণার তুল্য তুষার কণাগুলি নন্দাদেবীর মস্তকে উজ্জ্বল মুকুট পরাইয়া দিয়াছে। এই কঠিন হীরক কণাই ত্রিশূলাগ্র শাণিত করিতেছে।"

"শিব ও রুদ্র। রক্ষক ও সংহারক! এখন ইহার অর্থ বুঝিতে পারিলাম। মানসচক্ষে উৎস হইতে বারিকণার সাগরোদ্দেশে যাত্রা ও পুনরায় উৎসে প্রত্যাবর্তন স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম। এই মহাচক্র-প্রবাহিত স্রোতে সৃষ্টি ও প্রলয়রূপ পরস্পরের পার্শ্বে স্থাপিত দেখিলাম।"

এই রকম আরও অনেক রচনা উল্লেখ করা যেতে পারে যার মধ্য দিয়ে বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্রের পাশে পাশে আমরা সাহিত্যিক এবং দার্শনিক জগদীশচন্দ্রকে প্রত্যক্ষ করি। বিজ্ঞান ও দর্শনের এই রকম অপূর্ব সমন্বয় জগদীশচন্দ্র ব্যতিত আর কোন মনীষীর জীবনে ঘটেছিল কিনা জানা যায় না।